বল, তুমি মুশরিক নও আর এ শেরক থেকে মুক্ত হলে না, তখন তোমার খুব লজ্জিত হওয়া উচিত । কেননা অল্প হোক বেশী হোক – সবই শেরক। যখন বল – مَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্যে, তখন জানবে, তোমার অবস্থা গোলামের মত, যে নিজের পক্ষে নিরুদ্দেশ এবং মালিকের পক্ষে উপস্থিত । এ কলেমা যদি এমন ব্যক্তির মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়, যার হাসি, উঠাবসা, জীবনের আনন্দ ও মৃত্যু আতঙ্ক দুনিয়ার কাজের জন্যে হয়, তবে এ কলেমা তার অবস্থার সাথে সমাঞ্জস্যশীল নয়। যখন বল, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তখন জানবে, শয়তান তোমার দুশমন। সে তোমার অন্তরকে আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে ওঁৎ পেতে বসে আছে। কেননা, তুমি আল্লাহর জন্যে সেজদা কর– এটা তার জন্যে হিংসার কারণ । সে এক সেজদা বর্জন করার কারণে গলায় লানতের বেড়ি পড়েছে এবং অনন্তকালের জন্যে অভিশপ্ত হয়েছে। তুমি যে শয়তান থেকে আশ্রয় চাও, এটা তখনই ঠিক হবে যখন শয়তানের পছন্দনীয় বিষয়াদি বর্জন কর এবং তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় কাজকর্ম অবলম্বন কর। কেবল মুখে আশ্রয় চাওয়া চথেষ্ট নয়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্যে যদি কোন হিংস্র জন্তু অথবা দুশমন আসতে থাকে এবং সে ব্যক্তি নিজের স্থান ত্যাগ না করে মুখে বলে, আমি তোমা থেকে এই অজেয় দুর্গের আশ্রয় প্রার্থনা করি, তবে এতে তার কোন উপকার হবে না। আশ্রয় তখনই হবে, যখন সে স্থান ত্যাগ করে দুর্গের মধ্যে চলে যাবে। এমনিভাবে যেব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসারী, যা শয়তানের প্রিয় ও আল্লাহর অপ্রিয়, তার জন্যে মুখে আউযু বিল্লাহ্ বলা উপকারী হবে না। বরং তাকে এই মৌখিক উক্তির সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দুর্গে আশ্রয় নেয়ার ইচ্ছা করতে হবে। তাঁর দুর্গ হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আমার দুর্গ। যেব্যক্তি আমার দুর্গে প্রবেশ করে, সে আযাব থেকে নিরাপদ থাকে । এ দুর্গে সে ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে, যার মাবুদ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ নয় । যে তার খাহেশকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছে, সে শয়তানের ক্ষেত্রে বিচরণ করে– আল্লাহ তা'আলার দুর্গে নয়। শয়তান মানুষকে নামাযের মধ্যে

পরকাল চিন্তায় এবং সৎকর্মের ভাবনায় নিয়োজিত করে দেয় । এটাও শয়তানের একটা ধোঁকা, যাতে নামাযে যা পড়া হয়, নামাযী তা না বুঝে। মনে রেখ, কেরাআতের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে যা প্রতিবন্ধক হয়, তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা। কেননা, জিহবা নাড়াচাড়া করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ বুঝা উদ্দেশ্য ।

কেরাআতের ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার হয়ে থাকে – (১) যার জিহবা গতিশীল ; কিন্তু অন্তর গাফেল। (২) যার জিহ্বা নড়াচাড়া করে এবং অন্তর জিহবার অনুসরণ করে। সে ভাষা এমনভাবে বুঝে ও শুনে, যেন অন্যের কাছ থেকে শুনেছে। এটা আসহাবে ইয়ামীন তথা দক্ষিণপন্থীদের স্তর। (৩) যার অন্তর প্রথমে অর্থের দিকে দৌড়ে, এর পর জিহবা তার অনুসারী হয়ে সেসব অর্থ ব্যক্ত করে । নৈকট্যশীলদের জিহবা অন্তরের ভাষ্যকার ও অনুগামী হয়ে থাকে – অন্তর জিহবার অনুগামী হয় না। যখন বল بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি। তখন নিয়ত কর, আল্লাহ তা'আলার পাক কালাম শুরু করার জন্যে তাঁর কাছে বরকত চাই। এর অর্থ এই মনে কর, সব বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। অতএব اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ও ঠিক হয়। কেননা, এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহর । কারণ, সকল নেয়ামতই আল্লাহর পক্ষ থেকে। যেব্যক্তি কোন নেয়ামতকে গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে জানে অথবা গায়রুল্লাহর প্রশংসা করতে চায় এবং তাকে আল্লাহর আদেশের অধীন মনে করে না, তার জন্য বিসমিল্লাহ্ ও আলহামদু লিল্লাহ বলা ক্ষতিকর হবে। যখন বল, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম দয়ালু ও মেহেরবান, তখন অন্তরে তাঁর সকল প্রকার দয়া-দাক্ষিণ্য উপস্থিত কর, যাতে তাঁর রহমত তোমার কাছে প্রস্ফুটিত হয় এবং তুমি আশান্বিত হও। এরপর مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বিচার দিবসের মালিক বলে অন্তরে তাঁর তা'যীম ও ভয় জাগ্রত কর । কেননা, তিনি প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের মালিক। সুতরাং সেদিনের ভয়াবহতাকে ভয় করা উচিত । এরপর اِيَّاكَ نَعْبُدُ আমরা তোমারই এবাদত করি বলে এখলাস নতুন করে নাও এবং শক্তি সামর্থ্য থেকে অক্ষমতা একথা দ্বারা নতুন করে নাও, وَاِيَّاكَ

نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ আমরা আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন অন্তরে এটা নিশ্চিত করে নাও, আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁর এবাদতের তওফীক প্রাপ্ত হওনি। তোমাকে এবাদতের তওফীক দিয়ে এবং মোনাজাতের যোগ্য করে তিনি তোমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। যদি তিনি তোমাকে এবাদতের তওফীক থেকে বঞ্চিত করতেন, তবে তুমিও অভিশপ্ত শয়তানের সাথে দরবারে এলাহী থেকে বিতাড়িত হতে।

এসবের পর এখন তুমি তোমার সওয়াল নির্দিষ্ট কর এবং তাঁর কাছে তোমার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রার্থনা করে বল ঃ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। এর ব্যাখ্যা ও বিবরণের জন্যে বল صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি হেদায়েতের নেয়ামত বর্ষণ করেছ। বলাবাহুল্য, তাঁরা হলেন পয়গম্বরগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণগণ। غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ এবং পথভ্রষ্টদের পথও নয়। এরা হল কাফের ইহুদী, খৃষ্টান ও সাবেয়ী সম্প্রদায়। এর পর এই আবেদনের মঞ্জুরী চেয়ে বল اٰمِيْنَ অর্থাৎ এরূপই কর। এভাবে আলহামদু সূরা পাঠ করলে আশ্চর্য নয়, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এক হাদীসে কুদসীতে বলেন ঃ আমি নামাযকে আমার মধ্যে ও বান্দাদের মধ্যে আধাআধি করে নিয়েছি। অর্ধেক আমার ও অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দা তা পাবে যা সে চেয়েছে। سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলার উদ্দেশ্য তাই। এর অর্থ এই, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন যে তাঁর প্রশংসা করেছে। আল্লাহ তা'আলা মহান ও প্রতাপান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে স্মরণ করেছেন– এ ছাড়া নামাযে আর কিছু না থাকলে এটাই যথেষ্ট হত । কিন্তু যেখানে সওয়াবেরও আশা আছে, সেখানে তো সৌভাগ্যই সৌভাগ্য। অনুরূপভাবে যে সূরা তুমি পাঠ কর, তার অর্থ বুঝার চেষ্টা কর। কেরাআত পাঠে আল্লাহ তাআলার আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা, শাস্তিবাণী, উপদেশ, পয়গম্বরগণের খবর ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখের ব্যাপারে তোমার গাফেল হওয়া উচিত নয়। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটির

একটি হক আছে। উদাহরণতঃ ওয়াদার হক আশা করা, শাস্তিবাণীর হক ভয় করা, আদেশ ও নিষেধের হক তা পালন করার সংকল্প করা, উপদেশের হক উপদেশ গ্রহণ করা, অনুগ্রহ উল্লেখ করার হক তাঁর শোকর করা এবং পয়গম্বরগণের খবর বর্ণনার হক শিক্ষা গ্রহণ করা। নৈকট্যশীলরা এসব হক চেনেন এবং আদায় করেন। সেমতে যারারাহ্ ইবনে আবী আওফা নামাযে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ – (যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে) তখন তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। ইবরাহীম নখয়ী যখন اِذَا السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ (যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে) শুনতেন, তখন ব্যাকুল হয়ে পড়তেন এবং সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকত। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি বিষণ্ন অবস্থায় নামায পড়তেন। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ও শাস্তিবাণী দ্বারা অন্তর দগ্ধীভূত হওয়াই মানুষের জন্য উপযুক্ত। কেননা, গোনাহগার ও লাঞ্ছিত বান্দা প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহর সম্মুখে থাকে। এর পর কেরাআতে অক্ষরের উচ্চারণ ভালরূপে কর। দ্রুত পাঠ করো না। কেননা, আস্তে পাঠ করলে বুঝতে সহজ হয়। রহমত ও আযাবের আয়াতগুলো আলাদা আলাদা স্বরে পাঠ কর। ইবরাহীম নখয়ী এ ধরনের আয়াত অত্যন্ত নীচ স্বরে পাঠ করতেন–

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন উপাস্য নেই।

বর্ণিত আছে, কোরআন পাঠককে কেয়ামতের দিন বলা হবে ঃ পাঠ কর এবং উচ্চস্তরে উন্নীত হও। ভালরূপে পাঠ কর; যেমন দুনিয়াতে পাঠ করতে। সমগ্র কেরাআতে দণ্ডায়মান থাকার ইশারা হচ্ছে অন্তর আল্লাহ তাআলার সাথে একই অবস্থায় উপস্থিত থাকুক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা নামাযীর প্রতি মনোযোগী হন যে পর্যন্ত নামাযী অন্য দিকে ধ্যান না করে। অন্য দিকে দেখা থেকে মাথা ও চক্ষুর হেফাযত করা যেমন ওয়াজেব, তেমনি নামায ছাড়া অন্য দিকে ধ্যান করা থেকেও অন্তরের হেফাযত করা জরুরী। সুতরাং অন্তর অন্য দিকে সন্নিবেশিত

হলে তাকে স্মরণ করাও যে, আল্লাহ তাআলা তোমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। অন্তরে খুশু জরুরী করে নাও। কেননা, অন্য দিকে ধ্যান করা থেকে মুক্তি খুশুরই ফল। অন্তর খুশু করলে বাহ্যিক অঙ্গও খুশু করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন ঃ যদি তার অন্তর খুশু করত, তবে তার অঙ্গও খুশু করত। রাজা ও প্রজার অবস্থা একই রূপ হয়ে থাকে। তাই দোয়ায় বলা হয়েছে– এলাহী, রাজা ও প্রজা উভয়কে ঠিক কর। বলাবাহুল্য, রাজা হচ্ছে অন্তর এবং প্রজা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নামাযে পেরেকের মত এবং ইবনে যুবায়র (রাঃ) কাঠের মত থাকতেন। কোন কোন বুজুর্গ রুকুতে এমনভাবে থাকতেন যে, পাখীরা পাথর মনে করে উপরে এসে বসত। এসব বিষয় দুনিয়াতে বাদশাহদের সামনে মনের চাহিদায় হয়ে যায়। অতএব, রাজাধিরাজ আল্লাহর অবস্থা যারা জানে, আল্লাহর সামনে তাদের এরূপ অবস্থা কেন হবে না? যেব্যক্তি গায়রুল্লাহ্র সামনে খুশু করে এবং আল্লাহর সামনে তার হাত পা খেলাধুলায় মত্ত হয়, সে আল্লাহ্ তাআলার প্রতাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। সে জানে না, আল্লাহ্ তার অন্তর ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কে জ্ঞাত।

اَلَّذِيْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ـ

অর্থাৎ, যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দাঁড়াও এবং নামাযীদের মধ্যে তোমার নড়াচাড়া দেখেন।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইকরিমা বলেন ঃ তিনি দাঁড়ানো, রুকু, সেজদা ও বসার সময় দেখেন। রুকু ও সেজদা আদায় করার সময় নতুন নিয়ত ও সুন্নত অনুসরণের সাথে তাঁর আযাব থেকে ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করে উভয় হাত উত্তোলন কর এবং নতুন নম্রতা সহকারে রুকু কর। মনকে নরম করার চেষ্টা কর এবং নিজের হেয়তা ও আল্লাহ্র ইযযত কল্পনা কর। অন্তরে এর উপস্থিতির জন্যে জিহ্বা দ্বারা সাহায্য লও; অর্থাৎ মুখে سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (আমার মহান প্রভু পবিত্র)–এ বাক্যটি বার বার বল, যাতে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য জোরদার হয়। এর পর রুকু থেকে মাথা তুলে তাঁর রহমত আশা কর। অন্তরের এই আশাকে মুখে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে জোরদার কর। অর্থাৎ যে আল্লাহ্র প্রশংসা করে, আল্লাহ তার কথা শুনেন। এর পর

শোকর বয়ান কর। এতে নেয়ামত বৃদ্ধি পায় এবং رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে আমাদের রব, প্রশংসা আপনারই) বল। প্রশংসা বৃদ্ধির জন্যে এ শব্দগুলোও বল مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ অর্থাৎ, পূর্ণ পৃথিবী ও পূর্ণ আকাশমণ্ডলী পরিমাণে আপনার প্রশংসা। এর পর সেজদার জন্যে নত হও। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের হেয়তা। নিজের মুখমণ্ডল, যা সকল অঙ্গের মধ্যে অধিকতর প্রিয়, তাকে সর্বনিকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ মাটির উপর স্থাপন কর। মাটিতে সরাসরি সেজদা সম্ভব হলে মাটিতেই সেজদা কর। কেননা, এতে অনেক অনুনয় বিনয় অর্জিত হয়। নিজেকে নীচতম জায়গায় রাখার পর জানবে, তুমি তোমার নফসকে যেখানকার ছিল সেখানেই রেখে দিয়েছ। তুমি মূলতঃ মাটি থেকেই সৃজিত হয়েছ এবং মাটিতেই পুনরায় ফিরে যাবে। তখন অন্তরে আল্লাহর মাহাত্ম্য নতুনভাবে জাগ্রত কর এবং বল سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (আমার মহান প্রভু পবিত্র)– এ বাক্যটি বার বার বলে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য জোরদার কর। যখন তুমি তোমার অন্তর নরম হওয়ার কথা জানতে পার, তখন আল্লাহ্ তাআলার রহমত আশা কর। কেননা, তাঁর রহমত দুর্বল ও লাঞ্ছিতের দিকেই ধাবিত হয়– আস্ফালনকারীর দিকে নয়। এখন আল্লাহু আকবার বলতে বলতে মাথা উত্তোলন কর এবং একথা বলে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত কর رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ হে রব! ক্ষমা করুন, রহম করুন এবং যে গোনাহ আপনি জানেন, তা মার্জনা করুন। অথবা যে দোয়া তোমার পছন্দ হয় বল। এর পর বিনয় পাকাপোক্ত করার জন্যে এমনিভাবে দ্বিতীয় সেজদা কর। যখন তাশাহহুদের জন্যে বস, তখন আদবের সাথে বস এবং পরিষ্কার বল, নৈকট্যের যত কিছু রয়েছে– দরূদ হোক অথবা তাইয়্যেবাত তথা পবিত্র চরিত্র হোক, সকলই আল্লাহ্ তাআলার জন্যে। আত্তাহিয়্যাতুর অর্থ তাই। এর পর নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তা অন্তরে উপস্থিত করে বল اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ (হে নবী, আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত হোক)। মনে মনে সত্যিকারভাবে কামনা কর, এই সালাম তাঁর কাছে পৌঁছবে এবং তিনি এর জওয়াব অধিকতর পূর্ণতা সহকারে তোমাকে দান করবেন। এর পর তুমি নিজের প্রতি এবং আল্লাহ্ তাআলার সকল নেক বান্দার প্রতি

সালাম বল এবং আশা কর, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর জওয়াবে নেক বান্দাদের সংখ্যা পরিমাণে পূর্ণ সালাম দান করবেন। এর পর আল্লাহ তাআলার একত্ব ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতের সাক্ষ্য দাও এবং শাহাদতের উভয় বাক্য পাঠ করে আল্লাহর অঙ্গীকারকে নতুন কর। নামায শেষে হাদীসে বর্ণিত কোন দোয়া খুশু, নম্রতা, অসহায়তা, অক্ষমতা ও কবুল হওয়ার সত্যিকার প্রত্যাশা সহকারে পাঠ কর। দোয়ায় পিতামাতা ও সকল ঈমানদারকে শরীক কর। সালাম বলার সময় ফেরেশতা ও উপস্থিত মুসল্লীদের নিয়ত কর। সালাম দ্বারা নামায পূর্ণ করার নিয়ত কর এবং মনে মনে আল্লাহর শোকর কর, তিনি তোমাকে এই এবাদতটি পূর্ণ করার তওফীক দিয়েছেন। এটাকেই তোমার জীবনের শেষ নামায মনে কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ ছলে বলেছিলেন। নামায বিদায়ী নামাযের মত করে পড়। এর পর মনে মনে নামাযে ক্রটি করার ভয় ও শরম কর এবং আশংকা কর, নামায কোথাও নামঞ্জুর না হয়ে যায়। এর সাথে সাথে এ আশাও কর, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় এ নামায কবুল করে নেবেন। ইয়াহইয়া ইবনে ওহাব নামায শেষে কিছুক্ষণ থেমে যেতেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার ছাপ দৃষ্টিগোচর হত। ইব্রাহীম নখয়ী নামাযের পর এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন যেন তিনি রুগ্ন। এ অবস্থা সেসব নামাযীর, যারা নামাযে খুশু করেন, সর্বক্ষণ নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর সাথে মোনাজাতে ব্যাপৃত হন। সুতরাং নামাযে এসকল বিষয়ের অনুবর্তী হওয়া মানুষের উচিত। এগুলোর মধ্য থেকে যতটুকু অর্জিত হয়, তার জন্যে আনন্দিত হওয়া এবং যতটুকু অর্জিত না হয়, তার জন্যে দুঃখ করা উচিত। গাফেলদের নামায তো সুখকর নয়। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা রহমত করলে ভিন্ন কথা। তাঁর রহমত বিস্তৃত ও ব্যাপক। আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন স্বীয় রহমত দ্বারা আমাদেরকে ঢেকে নেন এবং মাগফেরাত দ্বারা আমাদের দোষত্রুটি গোপন করে নেন। অক্ষমতা স্বীকার করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই।

জেনে রাখ নামাযকে আপদ থেকে পাক করা, একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি করা এবং উল্লিখিত খুশু, তাযীম, শরম ইত্যাদি শর্ত সহকারে পড়া অন্তরে নূর হাসিল হওয়ার প্রধান উপায়। এ নূর কাশ্ফ তথা দিব্যদৃষ্টিতে দেখার চাবি। আল্লাহর ওলীগণ কাশফের মাধ্যমে যে আকাশ

ও পৃথিবীর রাজত্ব এবং প্রভুত্বের রহস্য জেনে নেন, তাও নামাযের মধ্যেই বিশেষতঃ সেজদাবস্থায় জেনে নেন। কেননা, সেজদার মাধ্যমে বান্দা তার পরওয়ারদেগারের নিকটবর্তী হয়। এজন্যেই আল্লাহ বলেন ঃ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ সেজদা কর এবং নৈকট্য হাসিল কর। প্রত্যেক নামাযীর নামাযে ততটুকু কাশফ হয়, যতটুকু সে দুনিয়ার জঞ্জাল থেকে পাক পবিত্র থাকে। এটা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও কাশ্ফ শক্তিশালী, কারও দুর্বল, কারও কম, কারও বেশী কারও সুস্পষ্ট এবং কারও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। কারও সামনে হুবহু বিষয় উন্মোচিত হয় এবং কেউ বিষয়ের দৃষ্টান্ত জানতে পারেন। যেমন কেউ দুনিয়াকে মৃতের আকারে দেখতে পেয়েছেন এবং শয়তানকে কুকুরের আকারে তার উপর বুক লাগিয়ে থাকতে দেখেছেন। কাশফের বিষয়ও বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কারও সামনে তার ক্রিয়াকর্ম। কিন্তু মানুষ এসব কাশফের বিষয় অস্বীকার করতে খুবই তৎপর। কারণ, যে বিষয় প্রত্যক্ষ নয়, তা অস্বীকার করা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। মাতৃগর্ভে শিশুর যদি বুদ্ধি জ্ঞান থাকত, তবে সে শূন্যে মানুষের অস্তিত্বের সম্ভাবনা অস্বীকার করত। অল্প বয়স্ক শিশুর যদি পার্থক্য জ্ঞান থাকত, তবে সে সেসব বিষয় অস্বীকার করত, যা বড়রা আকাশ ও পৃথিবীর রহস্য সম্পর্কে জানে। মানুষের অবস্থা তাই। যে অবস্থায় সে থাকে তার পরবর্তী অবস্থা সে অস্বীকার করে। যেব্যক্তি ওলীত্বের অবস্থা স্বীকার করে না, তার জন্যে নবুওয়তের অবস্থা অস্বীকার করাও জরুরী। অথচ মানুষ অনেক অবস্থার মধ্যে সৃজিত হয়েছে। সুতরাং নিজের স্তরের পরবর্তী স্তর অস্বীকার করা মানুষের উচিত নয়। যেব্যক্তি কাশফওয়ালা নয়, তার কমপক্ষে গায়েবের প্রতি বিশ্বাস রাখা উচিত, যে পর্যন্ত না অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেই প্রত্যক্ষ করে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত আছে– বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তাআলা নিজের ও তার মধ্যকার সকল পর্দা দূর করে দেন এবং তাকে নিজের সামনে নিয়ে আসেন। ফেরেশতারা তার কাঁধ থেকে নিয়ে শূন্য পর্যন্ত দণ্ডায়মান হয়ে তার নামাযের সাথে নামায পড়ে এবং তার দোয়ায় আমীন বলে। নামাযীর উপর আকাশের শূন্য থেকে তার মাথার সিঁথি পর্যন্ত পুণ্য বর্ষিত হয়। একজন ঘোষক ঘোষণা করে– যদি এই মোনাজাতকারী জানত, কার সাথে সে মোনাজাত করছে, তবে এদিক ওদিক তাকাত না।

নামাযীদের জন্যে আকাশের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সাথে নামাযীর সততা নিয়ে গর্ব করেন। সুতরাং আকাশের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহ তাআলা নামাযীর মুখোমুখি হওয়া আমাদের বর্ণিত কাশফেরই ইঙ্গিত বহন করে। তওরাতে লিখিত আছে– আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার সামনে ক্রন্দনরত অবস্থায় নামাযে দণ্ডায়মান হতে অক্ষম হয়ো না। কেননা, আমি তোমার অন্তরের নিকটবর্তী এবং তুমি গায়েব থেকে আমার নূর প্রত্যক্ষ করেছ। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা জানতাম, নামাযী অন্তরের যে নম্রতা ও ক্রন্দন অনুভব করে, তা এ কারণেই যে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের নিকটবর্তী হন, এ নৈকট্য স্থানের দিক দিয়ে নয় বিধায় হেদায়াত, রহমত ও পর্দা দূর করাই উদ্দেশ্য হবে। কথিত আছে, বান্দা যখন নামায পড়ে, তখন ফেরেশতাদের দশটি সারি তার জন্যে বিস্ময় প্রকাশ করে। প্রত্যেক সারিতে দশ হাজার ফেরেশতা থাকে। আল্লাহ্ তাআলা এই বান্দাকে নিয়ে এক লক্ষ্য ফেরেশতার সামনে গর্ব করে থাকেন। এর এক কারণ, মানুষ নামাযে একই সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, বসে, রুকু করে এবং সেজদা করে। অথচ আল্লাহ তাআলা এসব কাজ চল্লিশ হাজার ফেরেশতার মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের মধ্যে যারা দণ্ডায়মান, তারা কেয়ামত পর্যন্ত রুকু করবে না; যারা রুকুকারী তারা সেজদা করবে না; আর যারা সেজদাকারী, তারা কেয়ামত পর্যন্ত মাথা তুলবে না। উপবিষ্টদের অবস্থাও তদ্রূপ। দ্বিতীয় কারণ, ফেরেশতাদেরকে যে নৈকট্য ও মর্যাদা দান করা হয়েছে, তা সর্বদা অপরিবর্তনীয়। এতে হ্রাসবৃদ্ধি নেই। সেমতে কোরআন পাকে স্বয়ং ফেরেশতাদের উক্তি বর্ণিত আছে– وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ (আমাদের প্রত্যেকের জন্যে এক নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে)। এ ব্যাপারে মানুষের অবস্থা ফেরেশতাদের মত নয়। মানুষ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নতি করতে থাকে। সে সর্বক্ষণ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে এবং এতে উন্নতি করতে থাকে। এ উন্নতির দ্বার ফেরেশতাদের জন্যে রুদ্ধ। তাদের প্রত্যেকের সেই মর্যাদা যার উপর সে দণ্ডায়মান এবং সে এবাদত নির্দিষ্ট, যাতে সে মশগুল। তার না মর্যাদা পরিবর্তিত হয়, না সে এবাদতে ত্রুটি করে। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন ঃ

لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ يُسَبِّحُوْنَ

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর এবাদতে অহংকার এবং অলসতা করে না। তারা দিবারাত্র পবিত্রতা বর্ণনা করে– ক্লান্ত হয় না।

উন্নতির চাবিকাঠি নামাযে নিহিত। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

অর্থাৎ, যারা নামাযে খুশু করে, সেই মুমিনরাই সফল।

এখানে ঈমানের পর এক বিশেষ নামাযের গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে নামাযে খুশু থাকে। এর পর এই সফলকামদের গুণাবলী নামাযী দ্বারা খতম করে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ –অর্থাৎ, এবং যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে খবরদার। এরপর এসব গুণের ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তারাই অধিকারী জান্নাতুল ফেরদাউসের, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

আমি জানি না, যারা মনকে গাফেল রেখে কেবল জিহ্বা নাড়াচাড়া করে, তারা এই মহান মর্যাদার অধিকারী হবে কিভাবে? এজন্যেই তাদের বিপরীত লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرٍ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিয়ে এল? তারা বলবে ঃ আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

মোট কথা, নামাযীরাই জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী, আল্লাহ তাআলার নূর প্রত্যক্ষ্যকারী এবং তাঁর নৈকট্য দ্বারা লাভাবান হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং এমন লোকদের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন, যাদের কথা ভাল এবং কাজ মন্দ।

এখন আমরা খুশুকারীদের কয়েকটি প্রাণোদ্দীপক কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি।

প্রকাশ থাকে যে, খুশু ঈমান ও বিশ্বাসের ফল। এটা আল্লাহ তাআলার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের উপলব্ধি থেকে অর্জিত হয়। যে খুশু অর্জন করে, সে নামাযে এবং নামাযের বাইরে খুশু করে। এমনকি, নির্জনে এবং পায়খানায়ও খুশু করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অবগত– এ জ্ঞানই খুশুর কারণ। এছাড়া আল্লাহর মাহাত্ম্য ও নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জ্ঞান থেকেও খুশু সৃষ্টি হয়। এ তিনটি জ্ঞান কেবল নামাযের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ কারণেই জনৈক মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জাবোধ ও খুশুর কারণে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মাথা আকাশের দিকে উত্তোলন করেননি। রবী ইবনে খায়সাম দৃষ্টি ও মস্তক এতটা নত রাখতেন যে, কিছু লোক তাঁকে অন্ধ মনে করত। তিনি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর গৃহে কুড়ি বছর পর্যন্ত যাতায়াত করেন। তাঁর বাঁদী খায়সামাকে দেখে বলত ঃ আপনার অন্ধ বন্ধু আগমন করেছেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) একথা শুনে মুচকি হাসতেন। তিনি যখন দরজার কড়া নাড়া দিতেন, তখন বাঁদী বের হয়ে তাঁকে নতমস্তক ও চক্ষু মুদিত অবস্থায় দেখতে পেত।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) তাঁকে দেখে বলতেন ঃ

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ

অর্থাৎ, অনুনয়কারীদেরকে সুসংবাদ শুনাও।

তিনি আরও বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে দেখলে খুবই প্রীত হতেন । একদিন তিনি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর সাথে কর্মকারদের মধ্যে গেলেন। যখন আগুনের শিখা প্রজ্বলিত দেখলেন, তখন সজোরে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন । হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) নামাযের সময় পর্যন্ত তাঁর শিয়রে বসে রইলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ফিরে এল না। অবশেষে তাঁকে পিঠে তুলে আপন গৃহে নিয়ে গেলেন। পরের দিন প্রায় সেই সময়ে তাঁর হুশ হল, যে সময়ে বেহুশ হয়েছিলেন । ফলে পাঁচটি নামায তাঁর কাযা হয়ে গেল। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) তাঁর শিয়রে বসে বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, ভয় একেই বলে। এই রবী ইবনে খায়সম বলতেন ঃ আমি এমন কোন নামায পড়িনি, যাতে এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করেছি, আমি কি বলি এবং আমাকে কি বলা হবে। আমের ইবনে আবদুল্লাহ নামাযে খুশুকারীদের অন্যতম

ছিলেন। তিনি যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর কন্যা দফ্ (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাজাত এবং মহিলারা পরস্পর ইচ্ছামত কথাবার্তা বলত । কিন্তু তিনি কিছুই শুনতেন না এবং বুঝতেন না। একদিন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ নামাযের মধ্যে আপনার মন কোন কথা বলে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহ তাআলার সামনে আমার দন্ডায়মান হওয়া এবং সেখান থেকে দু'গৃহের মধ্যে থেকে একটির দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে উদয় হয়। কেউ বলল ঃ আমাদের মনে দুনিয়ার যেসব কথাবার্তা আসে, সেগুলো আপনি অন্তরে পান ? তিনি বললেন ঃ যদি আমার দেহে বর্শা বিদ্ধ হয়ে এপার ওপার চলে যায়, তবে এটা আমার কাছে নামাযে দুনিয়ার কথা চিন্তা করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। মুসলিম ইবনে ইয়াসারও এমনি বুযুর্গ ছিলেন । নামায পড়ার সময় মসজিদের একাংশ ভূমিসাৎ হয়েছিল; কিন্তু তিনি তা টের পারননি। জনৈক বুযুর্গের একটি অঙ্গ পচে যাওয়ার কারণে তা কেটে ফেলার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি তাতে সম্মত হলেন না। এক ব্যক্তি বলল ঃ নামাযের মধ্যে তিনি কোন কষ্ট টের পান না। সেমতে নামাযে থাকা অবস্থায় তাঁর অঙ্গ কর্তন করা হল । জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ নামাযের মধ্যে আপনার মন দুনিয়ার কোন কথা চিন্তা করে কি? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ নামাযের মধ্যেও করে না এবং নামাযের বাইরেও করে না। কোন কোন বুযুর্গ কুমন্ত্রণার ভয়ে সংক্ষেপে নামায পড়তেন। বর্ণিত আছে, আম্মার ইবনে ইয়াসির সংক্ষেপে একটি নামায আদায় করলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি সংক্ষেপে পড়লেন কেন? তিনি বললেন ঃ তুমি দেখেছ, আমি নামাযের সীমা একটুও হ্রাস করিনি। আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা পশ্চাতে ফেলে পড়েছি। বর্ণিত আছে, হযরত তালহা ও যুবায়র (রাঃ) সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন । তাঁরা বলতেন ঃ এতটুকু দ্বারা আমরা শয়তানের কুমন্ত্রণা পশ্চাতে ফেলে দেই। আবুল আলিয়াকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (যারা তাদের নামাযে উদাসীন)– এ আয়াতে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন ঃ যারা জানে না, কত রাকআতের পর নামায শেষ হবে। হাসান বসরী বলেন ঃ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা নামাযের সময় নামায পড়তে ভুলে যায়; এমনকি সময় অতিবাহিত হয়ে যায় । কেউ

কেউ বলেন ঃ যারা প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া সওয়াব এবং বিলম্বে পড়া গোনাহ মনে করে না। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক নামায পড়লেন এবং তাঁর কেরাআতে একটি আয়াত ছেড়ে দিলেন। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কেরাআতে কি পাঠ করেছি ? সকলেই চুপ করে রইল। হযরত উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আপনি অমুক সূরা পাঠ করেছেন এবং তার মধ্য থেকে অমুক আয়াতটি ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা জানি না, আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে কি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) উবাইকে বাহবা দিয়ে অন্যদেরকে লক্ষ্যে করে বললেন ঃ তোমাদের কি হল, তোমরা নামাযে উপস্থিত হও এবং কাতার পূর্ণ কর। তোমাদের নবী তোমাদের সামনে থাকেন। কিন্তু তোমরা টের পাও না, তিনি আল্লাহর কিতাব থেকে কি পাঠ করেন? শুন, বনী ইসরাঈলও এমন করেছিল । আল্লাহ তাআলা তাদের নবীর কাছে ওহী পাঠালেন –তোমার সম্প্রদায়কে বলে দাও, তোমরা আপন দেহ আমার সামনে রাখ এবং আপন কথা আমাকে দাও; কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে অনুপস্থিত থাক। তোমরা যা করছ, তা বাতিল। এ থেকে বুঝা যায়, ইমামের কেরাআত শ্রবণ করা ও বুঝা নিজে সূরা পাঠ করার স্থলাভিষিক্ত। মোট কথা, এসব কাহিনী একথা জ্ঞাপন করে যে, নামাযের মূল বিষয় হচ্ছে খুশু ও অন্তরের উপস্থিতি । গাফেল অবস্থায় কেবল নড়াচড়া করা আখেরাতে কম ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় আমাদেরকেও খুশুর তওফীক দান করুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইমামের করণীয়

প্রকাশ থাকে যে, নামাযের পূর্বে কেরাআত ও আরকানের মধ্যে এবং সালামের পরে ইমামের কিছু কিছু করণীয় রয়েছে। নামাযের পূর্বে ইমামের করণীয় ছয়টি ঃ

(১) যারা তাঁকে পছন্দ করে না, সে তাদের ইমামতি করবে না। যদি কতক লোক নাপছন্দ করে এবং কতক পছন্দ করে, তবে সংখ্যাধিক্যের অভিমত কার্যকর হবে। কিন্তু সংখ্যালঘু লোক সৎ ও দ্বীনদার হলে তাদের কথাই ধর্তব্য হওয়া উত্তম । হাদীসে আছে, তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথার উপরে উঠে না। এক, পলাতক গোলাম; দুই, যে মহিলার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তিন, এমন লোকদের ইমাম, যারা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। মুসল্লীদের অসন্তুষ্টির সাথে ইমামতি করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি তখনও নিষিদ্ধ যখন মুক্তাদীদের মধ্যে কেউ বেশী আলেম ও কারী হয়। হাঁ, যদি সে ইমামতি না করে, তবে অন্য লোক আগে যেতে পারে। এসব ব্যাপার না থাকলে মুসল্লীরা আগে যেতে বললে আগে চলে যাবে। একে অপরকে ইমামতি করতে বলা মাকরূহ। কথিত আছে, তকবীর হয়ে যাওয়ার পর কিছু লোক ইমামতি করার জন্যে একে অপরকে বলার কারণে তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা ইমামতি একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন । এর কারণ ছিল এই, তাঁরা ইমামতির জন্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতেন অথবা নিজের জন্যে ভুলের আশংকা এবং মানুষের নামাযের ক্ষতিপূরণ দানের ভয় করতেন। কেননা, ইমাম মুক্তাদীদের নামাযের জন্যে দায়ী হয়ে থাকে। আরেক কারণ ছিল, তাঁদের মধ্যে যেব্যক্তি ইমামতিতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাঁর অন্তর মুক্তাদীদের কাছে শরমের কারণে অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে যেত; বিশেষতঃ সরবে কেরাআত পড়ার অবস্থায়। ফলে নামাযে এখলাস থাকত না।

(২) কাউকে আযান ও ইমামতির মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার

স্বাধীনতা দেয়া হলে তার উচিত ইমামতি গ্রহণ করা। কেননা, উভয়টি ফযীলতের কাজ হলেও একই ব্যক্তির জন্য উভয় কাজ করা মাকরূহ। ইমাম ও মুয়াযযিন ভিন্ন ভিন্ন লোক হওয়া উচত। উভয়টি যখন একত্রিত করা যায় না, তখন ইমামতিই উত্তম। কেউ কেউ আযান উত্তম বলেছেন। আমরা এর ফযীলত ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আযান উত্তম হওয়ার আরেক কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন–

الامام ضامن والمؤذن مؤتمن

অর্থাৎ, ইমাম জামানতদার এবং মুয়াযযিন আমানতদার।

এতে জানা গেল, ইমামতির মধ্যে জামানতের আশংকা আছে। আরও এরশাদ হয়েছে–

الامام امير فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا

অর্থাৎ, ইমাম শাসক, যখন সে রুকু করে তোমরা রুকু কর এবং যখন সে সেজদা করে তখন তোমরা সেজদা কর।

হাদীসে আরও আছে– যদি ইমাম নামায পূর্ণ করে, তবে সওয়াব সে এবং মুক্তাদী সকলেই পাবে। আর যদি অপূর্ণ নামায পড়ে, তবে শাস্তি তারই হবে– মুক্তাদীদের নয়। এজন্যই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! ইমামদেরকে সৎপথ দেখান এবং মুয়াযিনদেরকে ক্ষমা করুন।

অতএব মাগফেরাত তলব কারা উচিত। কেননা, সৎপথ প্রার্থনাও মাগফেরাতের জন্যেই হয়।

এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তি এক মসজিদে সাত বছর ইমামতি করে তাঁর জন্যে জান্নাত ওয়াজিব। আর যে চল্লিশ বছর আযান দেয়, সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বর্ণিত আছে, এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম ইমামতি একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন। বিশুদ্ধ উক্তি হচ্ছে, ইমামতি উত্তম। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ), হযরত আবু বকর ও

হযরত ওমর (রাঃ) স্থায়ীভাবে ইমামতি করেছেন। এটা ঠিক, এতে জামানতের আশংকা আছে; কিন্তু ফযীলতও আশংকার সাথেই হয়ে থাকে। যেমন শাসক ও খলীফা হওয়া উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন সত্তর বছরের এবাদত থেকে উত্তম। বলাবাহুল্য, এটাও আশংকামুক্ত নয়। ইমামতি উত্তম বিধায় ইমামের অধিক আলেম হওয়া ওয়াজিব। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ইমাম তোমাদের শাফায়াতকারী হবে। সুতরাং তোমরা নামায সাফ করতে চাইলে তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে ইমাম বানাও।

জনৈক মনীষী বলেন ঃ পয়গম্বরগণের পর আলেমদের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। আলেমগণের পর ইমামগণের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। কেননা, এ তিনটি পক্ষই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর মখলুকের মধ্যে মাধ্যম। পয়গম্বরগণ নবুওয়তের কারণে; আলেমগণ এলেমের কারণে এবং ইমামগণ দ্বীনের প্রধান স্তম্ভ নামাযের কারণে এবং সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্যে একেই প্রমাণস্বরূপ উত্থাপন করেন। তাঁরা বলেছিলেন ঃ নামায ধর্মের স্তম্ভ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যাঁকে আমাদের দ্বীনের জন্যে পছন্দ করেছিলেন, তাঁকেই আমরা আমাদের দুনিয়ার জন্যে পছন্দ করলাম। সাহাবায়ে কেরাম হযরত বেলালকে খেলাফতের জন্যে পছন্দ করেননি এবং এই যুক্তি দেননি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে আযানের জন্যে পছন্দ করেছিলেন। আযান উত্তম। তাই তাঁকেই খেলাফতের জন্যে পছন্দ করে নেই।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলঃ আমাকে এমন আমল বলে দিন, যদ্দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ তুমি মুয়াযযিন হয়ে যাও। সে বলল ঃ এটা আমা দ্বারা হবে না। তিনি বললেন ঃ তবে ইমাম হয়ে যাও। সে বলল ঃ এটাও সম্ভব নয়। তিনি বললেন ঃ তবে ইমামের পেছনে নামায পড়। এ হাদীসে অগ্রে আযানের কথা বলার কারণে আযানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্ভবতঃ মনে করেছিলেন, লোকটি ইমামতি করতে রাজি হবে না। কেননা, আযান তার ইচ্ছাধীন কাজ। ইমামতি অন্যরা নিযুক্ত করলে এবং আগে বাড়িয়ে দিলে হয়। তাই প্রথমে মুয়াযযিন হতে বলেছেন।

(৩) ইমাম নামাযের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়বে। কেননা, আউয়াল ওয়াক্তের ফযীলত শেষ ওয়াক্তের উপর এমন, যেমন পরকালের ফযীলত ইহকালের উপর। হাদীসে আছে, বান্দা শেষ ওয়াক্তে নামায পড়ে, এতে তার নামায ফওত হয় না; কিন্তু আউয়াল ওয়াক্ত তার জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সবকিছু থেকে উত্তম ছিল। জামাআত বড় হবে– এই আশায় নামায দেরীতে আদায় করা উচিত নয়; বরং আউয়াল ওয়াক্তের ফযীলত হাসিলে তৎপর হওয়া উচিত। নামাযে লম্বা সূরা পাঠ করবে। এটা জামাআত বড় হওয়ার তুলনায় উত্তম। মনীষীগণ দুব্যক্তি এসে গেলে জামাআতের জন্যে তৃতীয় জনের অপেক্ষা করতেন না এবং জানাযায় চার জন এসে গেলে পঞ্চম জনের অপেক্ষা করতেন না। একবার সফরে ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওযুর কারণে বিলম্ব হয়ে গেলে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করা হয়নি। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে ইমাম করে দেয়া হলে তিনি নামায পড়লেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামাআতের সাথে এক রাকআত ফওত হয়ে যায়। তিনি তা পড়ার জন্যে দন্ডায়মান হলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ ঘটনার জন্যে আমরা মনে মনে ভীত ছিলাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা ঠিকই করেছ এবং ভবিষ্যতেও তাই করবে। একবার যোহরের নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেরী হয়ে গেলে মুসল্লীরা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সামনে বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আগমন করলেন, তখন সকলেই নামাযে ছিল, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুয়াযযিন ইমামের জন্যে অপেক্ষা করবে– ইমাম মুয়াযযিনের জন্যে নয়। ইমাম এসে গেলে অন্য কারও জন্যে অপেক্ষা করা যাবে না।

(৪) ইমাম এখলাসের সাথে ইমামতি করবে এবং নামাযের সকল শর্তে আল্লাহ তাআলার আমানত আদায় করবে। এখলাস এই, ইমামতির জন্যে কোন পারিশ্রমিক নেবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসমান ইবনে আবুল আছ সকফীকে আমীর নিযুক্ত করে বললেন ঃ এমন ব্যক্তিকে মুয়াযযিন করবে, যে আযানের জন্যে পারিশ্রমিক না নেয়। আযান নামাযের সহায়ক উপায়। এর জন্য যখন পারিশ্রমিক না নিতে বলেছেন, তখন নামাযের জন্যে আরও উত্তমরূপে না নেয়া উচিত। ইমাম যদি মসজিদের জন্যে ওয়াকফকৃত আমদানী থেকে নিজের ভরণ-পোষণ নিয়ে

নেয় অথবা বাদশাহের কাছ থেকে অথবা জনগণের কাছ থেকে কিছু পায়, তবে এটা নেয়া হারাম নয়, কিন্তু মাকরূহ। তারাবীহর ইমামতির জন্যে পারিশ্রমিক নেয়া ফরয নামাযের ইমামতির জন্যে নেয়া অপেক্ষা অধিক মাকরূহ। এ পারিশ্রমিক ইমাম নিজের নিয়মিত উপস্থিতি এবং মসজিদের সাজসরঞ্জাম দেখাশোনা করার বিনিময়ে মনে করে নেবে– নামাযের বিনিময় নয়। আমানত হল, অন্তরে পাপাচার, কবীরা গোনাহ ও সগীরা গোনাহ থেকে পবিত্র থাকা। ইমামতির দায়িত্ব পালনকারীকে এসব বিষয় থেকে যথাসাধ্য বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, সে মানুষের শাফায়াতকারী ও তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশকারী হয়ে থাকে। কাজেই তাদের মধ্যে তাঁর উত্তম ব্যক্তি হওয়া উচিত। এমনিভাবে বেওযু হওয়া থেকে এবং নাপাকী থেকে পাক হতে হবে। কেননা, এসব বিষয় সম্পর্কে অন্য কেউ অবগত হয় না। সুতরাং নামাযের মধ্যে বেওযু হওয়ার কথা স্মরণ হলে অথবা ওযু নষ্ট হয়ে গেলে লজ্জা করবে না; বরং নিকটে দন্ডায়মান ব্যক্তির হাত ধরে তাকে খলীফা করে দেবে। নামায চলাকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাপাকীর কথা স্মরণ হলে তিনি খলীফা নিযুক্ত করে দেন এবং গোসল করে পুনরায় নামাযে শরীক হন। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ প্রত্যেক সৎ অসৎ ব্যক্তির পেছনে নামায পড়ে নাও; কিন্তু পাঁচ ব্যক্তির পেছনে নামায পড়ো না–

(১) যে সর্বদা মদ্যপান করে, (২) প্রকাশ্য পাপাচারী, (৩) পিতামাতার নাফরমান, (৪) বেদআতী এবং (৫) পলাতক গোলাম।

(৫) কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত এবং ডানে-বামে না দেখা পর্যন্ত ইমাম নিয়ত বাঁধবে না। কাতারসমূহে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ইমাম তা ঠিক করে নিতে বলবে। আগেকার মনীষীগণ কাঁধে কাঁধ মিলাতেন এবং পরস্পরের হাঁটু মিলিয়ে নিতেন। মুয়াযযিন একামতের জন্যে এতটুকু অপেক্ষা করবে, যেন আহারকারী আহার শেষ করে নেয় এবং কেউ প্রস্রাব-পায়খানায় থেকে থাকলে তা থেকে ফারেগ হয়ে যায়। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্রাব-পায়খানার চাপের মুখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

(৬) ইমাম তকবীরে তাহরীমা ও সকল তকবীর সজোরে বলবে এবং মুক্তাদী এমনভাবে বলবে যেন নিজে শুনে। ইমাম তকবীর বলার পরে মুক্তাদী তকবীর বলবে; অর্থাৎ, ইমামের তকবীর শেষ হলে মুক্তাদী তকবীর শুরু করবে। একাকী নামায পড়ার সময় ইমামতির নিয়ত করে

দাঁড়াবে, যাতে সওয়াব পাওয়া যায়। যদি ইমামতির নিয়ত না করে এবং লোকেরা এসে তাঁর এক্তেদার নিয়ত করে, তবে সকলের নামায হয়ে যাবে এবং মুক্তাদীরা জামাআতের সওয়াবও পাবে; কিন্তু ইমাম ইমামতির সওয়াব পাবে না।

কেরাআতের মধ্যে ইমামকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন– (১) শুরুর দোয়া, আঊযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ আস্তে পড়তে হবে। আলহামদু ও অন্য সূরা ফজরের উভয় রাকআতে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকআতে সজোরে পড়বে। একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তিও এমনিভাবে পড়বে।

(২) সূরা পাঠ করার পর রুকুর পূর্বে ইমাম সামান্য বিরতি দেবে, যাতে কেরাআত রুকুর তকবীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। কেরাআত তকবীরের সাথে মিলিয়ে দিতে হাদীসে নিষেধ আছে।

ফজরের নামাযে মাসানী থেকে দুটি সূরা পড়বে– যাতে একশ' আয়াতের কম থাকে। ফজরের নামাযে দীর্ঘ কেরাআত পড়া সুন্নত । কোন কোন আলেম সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা মাকরূহ লেখেছেন। এটা তখন যখন কোন সূরার প্রথমাংশ পড়ে ছেড়ে দেয়। অথচ হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরা ইউনুসের কিছু অংশ পাঠ করেছেন। যখন মূসা (আঃ) ও ফেরআউনের আলোচনা এসেছে, তখন রুকুতে চলে গেছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি ফজরের নামাযে সূরা বাকারার এক আয়াত– قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا কে এক রাকআতে এবং দ্বিতীয় রাকআতে– رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ পাঠ করেছেন। তিনি শুনলেন, বেলাল বিভিন্ন সূরা থেকে পাঠ করেন। তাঁকে এর কারণে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের সাথে মিলিয়ে পড়ি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, বেশ তাই কর। যোহরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল ত্রিশ আয়াত পর্যন্ত, আছরে এর অর্ধেক এবং মাগরিবে মুফাসসালের শেষ আয়াতসমূহ অথবা শেষ সূরাসমূহ পাঠ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বশেষ যে মাগরিবের নামায পড়েছিলেন, তাতে সূরা মুরসালাত পাঠ করেন। এর পর ওফাত পর্যন্ত তিনি নামায পড়েননি। সারকথা, সংক্ষিপ্ত কেরাআত পাঠ করা উত্তম; বিশেষতঃ যখন জামাআত খুব বড় হয়। এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ লোকজনকে নামায পড়ায়, তখন সংক্ষিপ্ত কেরাআত

পড়বে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কাজের লোক থাকে। একাকী পড়লে যত ইচ্ছা লম্বা কেরাআত পড়বে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) এক জনগোষ্ঠীকে এশার নামায পড়াতেন। একদিন তিনি তাতে সূরা বাকারা পাঠ করলেন। এক ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিয়ে আলাদা পড়ে নিল। লোকেরা বলাবলি করল, লোকটি মোনাফেক হয়ে গেছে। লোকটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলে তিনি মুয়ায ইবনে জাবালকে শাসিয়ে বললেন ঃ তুমি কি মানুষকে বিপদে ফেলতে এবং ধর্মচ্যুত করতে চাও? তুমি সূরা আ'লা, সূরা তারেক ও সূরা যুহা পাঠ কর।

নামাযের রোকনসমূহের মধ্যে ইমাম রুকু ও সেজদা হালকা করবে এবং তিন বারের বেশী তসবীহ পড়বে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাযের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ নামায আর কারও দেখিনি। এ নামায হালকাও হত এবং পূর্ণরূপে আদায় হত। বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের পেছনে নামায পড়লেন যখন তিনি মদীনার গভর্নর ছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি এই যুবকের নামাযকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাযের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা ওমর ইবনে আবদুল আজীজের পেছনে দশ দশ বার তসবীহ বলতাম। এটা ভাল; কিন্তু জামাআত বড় হলে তিন বার বলা উত্তম। জামাআতে কেবল দ্বীনদার সাধক শ্রেণীর লোক থাকলে দশ বার বলায় ক্ষতি নেই। মুক্তাদীরা ইমামের আগে কোন কিছু করবে না; বরং রুকু ও সেজদায় তাঁর পশ্চাতে যাবে। ইমামের মাথা মাটিতে না পৌঁছা পর্যন্ত মুক্তাদী সেজদার জন্যে নত হবে না। সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক্তেদা এভাবেই করতেন। ইমাম রুকুতে ভালরূপে না যাওয়া পর্যন্ত মুক্তাদী রুকুর জন্যে নত হবে না। সালাম ফেরানোর সময় ইমাম উভয় সালামে মুসল্লী ও ফেরেশতাদের নিয়ত করবে। ফরয নামায পড়ার স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র নফল নামায পড়বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এরূপই করেছেন। হাদীসে আছে– রসূলুল্লাহ (সাঃ) সালামের পর নিম্নোক্ত দোয়া বলা পর্যন্ত বসে থাকতেন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইমামতির এসব নিয়ম-নীতি পালন করার তওফীক দিন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জুমআর ফযীলত

জানা উচিত, জুমআর দিন একটি মহান দিন। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে ইসলামকে মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং একে মুসলমানের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, যখন জুমআর দিন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরের দিকে ত্বরা করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে।

এ আয়াতে দুনিয়ার কাজকর্মে মশগুল হওয়া এবং জুমআয় যাওয়ার পরিপন্থী সকল কাজ-কারবার হারাম করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ان الله عزوجل فرض عليكم الجمعة فى يومى هذا فى مقامى هذا ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর জুমআ ফরয করেছেন আমার এদিনে ও এ স্থানে। এক রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ

من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি বিনা ওযরে তিন বার জুমআ তরক করে, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। সে জুমআ ও জামাআতে উপস্থিত হত

না। এখন তার অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন ঃ সে দোযখী। লোকটি একমাস পর্যন্ত তাঁর কাছে এসে এ প্রশ্নই করল এবং তিনি উত্তর দিলেন, সে দোযখী। হাদীসে আছে, ইহুদী ও খ্রীস্টানদেরকে জুমআর দিন দেয়া হলে তারা এতে বিরোধ করল। তাই তাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত করে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। এ উম্মতের জন্যে একে ঈদ করা হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন। তাঁর হাতে একটি উজ্জ্বল আয়না ছিল। তিনি বললেন ঃ এটা জুমআ। যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করেছেন, যাতে আপনার এবং আপনার উম্মতের জন্যে এটা ঈদ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ জুমআ দিয়ে আমাদের কি উপকার হবে? তিনি বললেন ঃ এতে একটি সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত আছে। যেব্যক্তি এ মুহূর্তে নিজের কল্যাণের জন্যে দোয়া করবে, যদি সেই কল্যাণ তার নসীবে না থাকে, তবে তার তুলনায় অনেক বেশী তার জন্য সঞ্চিত রাখবেন। অথবা কেউ এ মুহূর্তে কোন বালা মসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে যদি সেই বালা মসিবত তার নসীবে লেখা থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা বালা-মুসিবত অপেক্ষা বড় বালা-মসিবত থেকেও তাকে রক্ষা করবেন। আমাদের কাছে এদিন সকল দিনের সর্দার। আমরা একে আখেরাতে يوم المزيد বৃদ্ধির দিন বলব। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আপনার পরওয়ারদেগার জান্নাতে একটি শুভ্র ও মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত উপত্যকা নির্দিষ্ট করেছেন। জুমআর দিন হলে তিনি ইল্লিয়্যীন থেকে তথায় তাঁর সিংহাসনে অবতরণ করবেন এবং মানুষের জন্যে দ্যুতি বিকিরণ করবেন, যাতে তারা তাঁকে দেখতে পায়। এক হাদীসে আছে, যে সর্বোত্তম দিনের উপর সূর্য উদিত হয়েছে, তা হচ্ছে জুমআর দিন। এদিনে হযরত আদম (আঃ) সৃজিত হয়েছেন। এদিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয়েছে। এদিনেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয়েছে। এদিনেই তাঁর তওবা কবুল হয়েছে। এদিনেই তাঁর ওফাত হয়েছে। এদিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। এদিন আল্লাহর কাছে বৃদ্ধির দিন। আকাশে ফেরেশতারা একে তা-ই বলে। এদিনেই জান্নাতে খোদায়ী দীদার হবে।

হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জুমআর দিনে ছয় লক্ষ

বান্দাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন জুমআর দিন সহি-সালামত থাকে, তখন অন্য দিনও সহি-সালামত থাকে। তিনি আরও বলেছেন ঃ প্রত্যহ সূর্য যখন আকাশের মাঝখানে থাকে, তখন দোযখ উত্তপ্ত করা হয়। তখন নামায পড়ো না; কিন্তু জুমআর দিন সবটুকুই নামাযের সময়। এদিনে দোযখ উত্তপ্ত করা হয় না। হযরত কা'ব বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা শহরসমূহের মধ্যে মক্কা মোয়াযযমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, মাসসমূহের মধ্যে রমযানকে, দিনসমূহের মধ্যে জুমআকে এবং রাত্রিসমূহের মধ্যে শবে কদরকে ফযীলত দিয়েছেন। কথিত আছে, পক্ষীসমূহ এবং ইতর কীট-পতঙ্গ জুমআর দিনে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং বলে ঃ সালাম, সালাম, এটা ভাল দিন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে শহীদের সওয়াব লেখেন এবং কবরের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেন।

জুমআর শর্ত

প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য নামাযে যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলো জুমআর মধ্যেও শর্ত। কিন্তু কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত জুমআর মধ্যে রয়েছে, যা অন্যান্য নামাযে নেই। প্রথমতঃ যোহরের সময় হওয়া। সুতরাং যদি জুমআর নামাযে ইমামের সালাম আসরের সময়ে পড়ে যায়, তবে জুমআ বাতিল হবে। তখন ইমামের জন্যে জরুরী হবে, দু'রাকআত আরও বাড়িয়ে যোহর পূর্ণ করা। দ্বিতীয়তঃ জুমআর জন্যে উপযুক্ত স্থান শর্ত। সুতরাং জঙ্গলে, বিজন স্থানে ও তাঁবুতে জুমআর নামায হয় না। এর জন্যে অস্থাবর দালান বিশিষ্ট স্থান জরুরী। তৃতীয়তঃ জামাআত হওয়া শর্ত। শাফেয়ী মাযহাবে কমপক্ষে চল্লিশ জন এবং হানাফী মাযহাবে ইমামসহ তিন জন হওয়া জরুরী। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শহরের কয়েক জায়গায় জুমআ হলে যে ইমাম শ্রেষ্ঠ, তাঁর পেছনে জুমআ পড়া উত্তম। এক্ষেত্রে মুসল্লীদের সংখ্যাধিক্যও লক্ষণীয় ব্যাপার। চতুর্থতঃ দু'খোতবা দেয়া এবং উভয় খোতবার মাঝখানে বসা। প্রথম খোতবায় চারটি বিষয় থাকা ওয়াজিব– (১) আল্লাহর প্রশংসা করা এবং কমপক্ষে আলহামদু লিল্লাহ বলা, (২) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা,

(৩) তাকওয়ার উপদেশ দেয়া এবং (৪) কোরআন পাক থেকে একটি আয়াত পাঠ করা। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খোতবায়ও এ চারটি বিষয় ওয়াজিব। কিন্তু আয়াত পাঠের জায়গায় দোয়া পাঠ করা ওয়াজিব। উভয় খোতবা শ্রবণ করাও ওয়াজিব।

প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান মুসলমান ব্যক্তির উপর জুমআ ফরয। যাদের উপর জুমআ ফরয তাদের জন্যে বৃষ্টি, কর্দমাক্ততা, ভয়, অসুস্থতা ও অসুস্থ ব্যক্তির দেখাশুনা করার ওযরে জুমআ তরক করার অনুমতি আছে। তাদের জন্যে জুমআর নামায শেষ হওয়ার পর যোহর পড়া মোস্তাহাব। যদি জুমআর নামাযে গোলাম, মুসাফির ও মগ্ন ব্যক্তি হাযির হয় তবে তাদের জুমআ দুরস্ত হবে। যোহরের নামায পড়তে হবে না।

জুমআর আদব

জুমআর ফযীলত লাভের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার থেকে তৎপর হওয়া উচিত। সেমতে আসরের পর দোয়া, এস্তেগফার ও তসবীহ পাঠে মশগুল হবে। কেননা, এ সময়টি জুমআর মধ্যে অজ্ঞাত মুহূর্তের সমান ফযীলত রাখে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের জীবিকা ছাড়া আরও একটি অনুগ্রহ আছে, যা থেকে তিনি তাকে দেন, যে তাঁর কাছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এবং জুমআর দিন তা তলব করে। বৃহস্পতিবার দিন কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করবে। সুগন্ধিও যোগাড় করবে। এ রাত্রে জুমআর দিনে রোযা রাখার নিয়ত করবে। এর অনেক সওয়াব। কিন্তু এর সাথে বৃহস্পতিবার অথবা শনিবারের রোযা মিলিয়ে নেবে। কেননা, শুধু জুমআর দিন রোযা রাখা মাকরূহ। এ রাত্রিটি নামায ও খতমে কোরআনে অতিবাহিত করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। কেউ কেউ এ রাতে স্ত্রীসহবাস মোস্তাহাব বলেছেন। তাঁরা এ হাদীসের উদ্দেশ্য তাই বলেছেন ঃ رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل

আল্লাহ রহম করুন সেই ব্যক্তির প্রতি, যে প্রথম ওয়াক্তে জুমআয় আসে, শুরু থেকে খোতবা শুনে এবং গোসল করায় ও গোসল করে। এখানে গোসল করায় অর্থ স্ত্রীকে গোসল করায়। এসব কাজ করলে পূর্ণরূপে জুমআকে স্বাগত জানানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গাফেলদের

শ্রেণী থেকে বের হয়ে যাবে, যারা সকাল বেলায় জিজ্ঞেস করে, আজ কোন্ দিন? জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ জুমআর পূর্ণ অংশ সেই ব্যক্তি পায়, যে একদিন পূর্ব থেকে এর অপেক্ষা করে। আর ক্ষুদ্র অংশ সেই ব্যক্তি পায়, যে সকালে জিজ্ঞেস করে, আজ কোন্ দিন? কোন কোন বুযুর্গ জুমআর পূর্ব রাতে জামে মসজিদেই থাকতেন।

জুমআর দিন ফজর হতেই গোসল করা উচিত, যদিও তখন জামে মসজিদে না যায়। কিন্তু এর কাছাকাছি সময়েই মসজিদে যাওয়া উচিত, যাতে গোসল ও মসজিদে যাওয়া কাছাকাছি সময়ে হয়। জুমআর দিন গোসল করা তাকিদসহ মোস্তাহাব। কোন কোন আলেম একে ওয়াজিব বলেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم -

অর্থাৎ, জুমআর গোসল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর ওয়াজিব।

এক মশহুর হাদীসে আছে–

من اتى الجمعة فليغتسل -

অর্থাৎ, যে জুমআয় উপস্থিত হয়, তার গোসল করা উচিত।

মদীনার মুসলমানরা কাউকে মন্দ বলার ক্ষেত্রে এরূপ বলত ঃ তুমি তার চেয়েও খারাপ, যে জুমআর দিন গোসল করে না।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) জুমআর খোতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত ওসমান (রাঃ) মসজিদে আগমন করলেন। এ সময়ে আগমন খারাপ মনে করে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ এটা কোন্ সময়? অর্থাৎ, আগে এলেন না কেন? হযরত ওসমান (রাঃ) জওয়াব দিলেন ঃ আমি আযান শুনার পর দেরী করিনি। ওযু করেই চলে এসেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ একটি নয়, দুটি হল। আপনি তো জানেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকিদ সহকারে জুমআর দিন গোসল করার জন্যে বলতেন। আপনি কেবল ওযু করলেন। এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন ওযু করে, সে ভাল করে। আর যে গোসল করে সে সর্বোত্তম কাজ করে। এ থেকে জানা গেল, গোসল তরক করাও জায়েয।

জুমআর দিন সাজসজ্জা করা মোস্তাহাব। তিনটি বিষয় সাজসজ্জার অন্তর্ভুক্ত– পোশাক, পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। পরিচ্ছন্নতার মধ্যে রয়েছে মেসওয়াক করা, চুল কাটা, নখ কাটা ও গোঁফ কাটা। এছাড়া পবিত্রতা অধ্যায়ে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও করা উচিত। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন নখ কাটে, আল্লাহ তাআলা তার নখ থেকে রোগ দূর করে দেন। নিজের কাছে যে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি থাকে, তা জুমআর দিন ব্যবহার করবে, যাতে দুর্গন্ধ দূর হয় এবং উপস্থিত মুসল্লীরা আরাম বোধ করে। পুরুষদের জন্যে উত্তম সুগন্ধি হচ্ছে যার গন্ধ প্রকট এবং রং অস্পষ্ট। পক্ষান্তরে নারীদের জন্যে সেই সুগন্ধি উত্তম, যার রং উজ্জ্বল এবং গন্ধ গোপন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি তার কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখে, তার মনোকষ্ট কম হয় এবং যার সুগন্ধি উৎকৃষ্ট, তার বুদ্ধি বাড়ে। সাদা পোশাক সর্বোত্তম। আল্লাহ তা'আলার কাছে সাদা পোশাক অধিক পছন্দনীয়। কাল পোশাকে কোন সওয়াব নেই। কেউ কেউ কাল পোশাকের দিকে তাকানো মাকরূহ বলেছেন। জুমআর দিনে পাগড়ী পরিধান করা মোস্তাহাব। ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুমআর দিন পাগড়ী পরিধানকারীদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। সুতরাং গরমে কষ্ট হলে নামাযের পূর্বে ও পরে পাগড়ী খুলে ফেলায় দোষ নেই।

জামে মসজিদে সকালেই রওয়ানা হওয়া উচিত। এর সওয়াব অনেক। যাওয়ার সময় খুশু সহকারে থাকবে। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত মসজিদে এতেকাফের নিয়ত করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে আউয়াল ওয়াক্তে যায় সে যেন একটি উট কোরবানী করে; যে দ্বিতীয় প্রহরে যায়, সে যেন একটি গরু কোরবানী করে; যে তৃতীয় প্রহরে যায়, সে যেন শিংবিশিষ্ট ভেড়া কোরবানী করে; যে চতুর্থ প্রহরে যায়, সে যেন খোদার পথে মুরগী যবেহ করে এবং যে পঞ্চম প্রহরে যায়, সে যেন একটি ডিম আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করে। ইমাম যখন খোতবার জন্যে বের হয়ে আসেন, তখন আমলনামা বন্ধ করে দেয়া হয়, কলম তুলে নেয়া হয় এবং ফেরেশতারা মিম্বরের কাছে সমবেত হয়ে যিকির শ্রবণ করে। এ সময় যারা আসে তারা কোন সওয়াব পায় না। সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রথম

ওয়াক্ত, এক বর্শা পরিমাণ সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রহর, রৌদ্র প্রখর থাকা পর্যন্ত তৃতীয় প্রহর এবং এ সময় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত চতুর্থ ও পঞ্চম প্রহর। এ দু'প্রহরে সওয়াব কম । সূর্য ঢলে পড়ার পর নামাযের সময়। এতে কোন সওয়াব নেই। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি কাজের সওয়াব যদি মানুষ জানত, তবে সেগুলোর জন্যে মানুষ সওয়ারীতে বসে রওয়ানা হয়ে যেত- (১) আযান, (২) জামাআতের প্রথম সারি এবং (৩) ভোরে জুমআর নামাযের জন্যে মসজিদে যাওয়া ।

এক হাদীসে আছে, জুমআর দিন ফেরেশতারা হাতে রূপার কাগজ ও স্বর্ণের কলম নিয়ে জামে মসজিদের দরজাসমূহে বসে যায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে আগমনকরীদের নাম লিপিবদ্ধ করে। এক হাদীসে আছে, যখন কোন বান্দা জুমআর দিনে দেরী করে, তখন ফেরেশতারা তাকে তালাশ করে এবং তার অবস্থা একে অপরের কাছে জিজ্ঞেস করে। তারা বলে ঃ ইলাহী, যদি দারিদ্র্যের কারণে তার দেরী হয়ে থাকে, তবে তাকে ধনাঢ্য কর। রোগের কারণে দেরী হয়ে থাকলে তাকে সুস্থতা দান কর। কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে দেরী হলে তাকে অবসর দান কার। কোন খেলার কারণে দেরী হয়ে থাকলে তার অন্তর এবাদতের দিকে ফিরিয়ে দাও। প্রথম শতাব্দীতে সেহরীর সময় এবং সোবহে সাদেকের পরে রাস্তা জনাকীর্ণ থাকত। লোকজন প্রদীপ হাতে জামে মসজিদে ঈদের দিনের মত দলে দলে গমন করত। আস্তে আস্তে এটা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইসলামে এটাই প্রথম বেদআত ছিল, লোকজন জুমআর দিন ভোরে মসজিদে যাওয়া ত্যাগ করল। ইহুদী খৃষ্টানদের দেখেও মুসলমানের লজ্জা হয় না। তারা তাদের এবাদত গৃহে শনিবার ও রবিবার প্রত্যূষে যায়। দুনিয়াপ্রার্থীরাও ক্রয়-বিক্রয় মুনাফা উপার্জনের জন্যে খুব ভোরে বাজারে যায়। আখেরাতের প্রার্থীদের কি হল, তারা এ ব্যাপারে অগ্রগামী হয় না? কথিত আছে, মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করবে, তখন তারা ততটুকু নৈকট্য পাবে, যতটুকু প্রত্যূষে জুমআয় গমন করবে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) জামে মসজিদে খুব ভোরে গিয়ে দেখেন, তিন ব্যক্তি তাঁরও আগে মসজিদে বিদ্যমান রয়েছে। এতে তিনি দুঃখিত হলেন এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললেন ঃ চার জনের মধ্যে আমি চতুর্থ হলাম ।

জামে মসজিদে প্রবেশ করার পর মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে এবং সামনে দিয়ে যাবে না। অনেক আগে গেলে এরূপ করার প্রয়োজনই হবে না। মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তিকে পুল করে মানুষকে তার উপর দিয়ে যেতে বলা হবে। ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমআর খোতবা দেয়ার সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে এসে বসে গেছে। নামাযের পর তিনি সেই লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ ব্যাপার কি, তুমি আজ আমাদের সাথে জুমআয় শরীক হলে না? লোকটি বলল ঃ হুযুর, আমি তো জুমআয় উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে দেখেছিলাম। এতে ইঙ্গিত আছে, লোকটির আমল বেকার হয়েছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, লোকটি আরজ করল ঃ হুযুর আমাকে দেখেননি? তিনি বললেন ঃ আমি দেখেছি, তুমি দেরীতে এসেছ এবং মানুষকে কষ্ট দিয়েছ। হাঁ, প্রথম কাতার খালি পড়ে থাকলে মানুষের উপর দিয়ে যাওয়া দূষণীয় নয়। কারণ, তখন মানুষ নিজেরাই নিজেদের হক নষ্ট করে এবং ফযীলতের স্থান ছেড়ে দেয়। হযরত হাসান বলেন ঃ যারা জুমআর দিনে জামে মসজিদের দরজায়ই বসে যায়, তাদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাও। তাদের কোন ইযযত নেই।

নামায পড়ার সময় নামাযীর সামনে দিয়ে যাবে না। নামাযী নিজে স্তম্ভ অথবা প্রাচীরের কাছে বসবে, যাতে কেউ সামনে দিয়ে না যায়। নামাযীর সামনে দিয়ে গেলে নামায ফাসেদ হয় না ঠিক; কিন্তু এটা নিষিদ্ধ । রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মুসলমানের জন্যে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ মানুষের জন্যে ছাই ও ধুলা হয়ে বাতাসে উড়ে যাওয়া নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া অপেক্ষা ভাল। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, যদি কেউ জানত নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া কত বড় গোনাহ্, তবে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্যে উত্তম হত। যদি স্তম্ভ, প্রাচীর অথবা বিছানো জায়নামাযের ভিতরের ভাগ দিয়ে কেউ গমন করে, তবে নামাযীর উচিত তাকে হটিয়ে দেয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নামাযীর উচিত তাকে হটিয়ে দেয়া । যদি না মানে তবে আবার হটিয়ে দেবে। যদি

এর পরও না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, সে শয়তান। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর সামনে দিয়ে কেউ গেলে তিনি সজোরে ধাক্কা দিতেন। ফলে সে মাটিতে পড়ে যেত। প্রায়ই তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন। মারওয়ানের কাছে এ অভিযোগ গেলে মারওয়ান বলতেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে এরূপ করার আদেশ দিয়েছেন । নামাযীর উচিত সামনে এক হাত দীর্ঘ কোন খুঁটি পুঁতে নেয়া, যাতে সীমা চিহ্নিত হয়ে যায়।

জুমআর নামাযে প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করবে। এর সওয়াব অনেক। রেওয়ায়েত আছে– যেব্যক্তি পরিবারের লোকজনকে গোসল করায়, নিজে গোসল করে, সকালে মসজিদে যায়, প্রথম খোতবা পায় এবং ইমামের কাছে থেকে খোতবা ও কেরাআত শ্রবণ করে, এটা তার জন্যে দু'জুমআর মধ্যবর্তী দিন এবং আরও তিন দিনের গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। অন্য এক রেওয়ায়েতে প্রথম কাতার অন্বেষণ করার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু যদি ইমামের কাছে এমন কোন বিষয় থাকে, যা পরিবর্তন করতে তুমি অক্ষম; যেমন ইমাম রেশমী বস্ত্র পরিহিত হলে অথবা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নামাযে এলে প্রথম কাতার থেকে পেছনে থাকা তোমার জন্যে উত্তম । কেননা, এমতাবস্থায় প্রথম কাতারে থাকলে তোমার ধ্যান বিক্ষিপ্ত হবে। কোন কোন আলেম এহেন অবস্থায় নিরাপত্তার খাতিরে প্রথম কাতার বর্জন করেছেন। বিশর ইবনে হারেসকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আমরা আপনাকে ভোর বেলায় মসজিদে আসতে দেখি। কিন্তু আপনি শেষ কাতারসমুহে নামায পড়েন। এটা কেন? তিনি বললেন ঃ অন্তরের নৈকট্য উদ্দেশ্য– দেহের নয়। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, পেছনের কাতারে থাকা অন্তরের জন্যে ভাল । সুফিয়ান সওরী শোয়ায়েব ইবনে হরবকে মিম্বরের কাছে আবু জাফর মনসুরের খোতবা শুনতে দেখলেন। নামাযান্তে সুফিয়ান শোয়ায়েবকে বললেন ঃ মনসুরের কাছে আপনাকে বসা দেখে আমি বিচলিত হয়েছি। যদি আপনি তার মুখে এমন কোন কথা শুনেন, যার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়, তবে আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন কি? এরা কাল পোশাকের বেদআত আবিষ্কার

করেছে। শোয়ায়েব বললেন ঃ হাদীসে কি ইমামের কাছে থাকতে এবং খোতবা শুনতে বলা হয়নি? সুফিয়ান বললেন ঃ এটা খোলাফায়ে রাশেদীনের বেলায় প্রযোজ্য। এদের কাছ থেকে তো যত দূরে থাকা যায়, ততই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে। হযরত সাঈদ ইবনে আমের বলেন ঃ আমি হযরত আবু দারদার সাথে নামায পড়ি। তিনি নামাযে পেছনের কাতারে যেতে লাগলেন। অবশেষে আমরা সর্বশেষ কাতারে চলে গেলাম । নামাযান্তে আমি তাঁকে বললাম ঃ প্রথম কাতার কি সব কাতার অপেক্ষা উত্তম নয়? তিনি বললেন ঃ হাঁ, কিন্তু এটা রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। এ উম্মতের প্রতি রহমতের দৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নামাযে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন, তখন তার পেছনে যত মানুষ থাকে, সকলকে ক্ষমা করে দেন। অতএব আমি এই আশা নিয়ে সকলের পেছনে দাঁড়িয়েছি, সম্মুখের কাতারের যার প্রতি আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টি দেবেন, তাঁর ওসিলায় আমার মাগফেরাত হয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু দারদা এ বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। সুতরাং যেব্যক্তি এরূপ নিয়ত সহকারে পেছনের কাতারে থাকে, অন্যকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে, তার জন্যে এতে কোন দোষ নেই। প্রকাশ থাকে যে, মিম্বরের সাথে সংলগ্ন পূর্ণ কাতারকে প্রথম কাতার ধরা হবে। সুতরাং মিম্বর যদি কোন কাতারকে কেটে দেয়, তবে মিম্বরের দু'পাশে যে কাতার, তা পূর্ণ কাতার নয়। তাই একে প্রথম কাতার ধরা হয় না। হযরত সুফিয়ান সওরী বলতেন ঃ মিম্বরের সম্মুখস্থ কাতার প্রথম কাতার। কেননা. এটাই মিম্বর সংলগ্ন কাতার । এতে উপবিষ্ট ব্যক্তি ইমামের সম্মুখে থাকে এবং তাঁর খোতবা শুনে। কিন্তু মিম্বরের প্রতি লক্ষ্য না করে যে কাতার কেবলার অধিক নিকটবর্তী, তাকে প্রথম কাতার বলা সম্ভবপর।

ইমাম যখন মিম্বর যান, তখন নামায বন্ধ করতে হবে এবং কথাবার্তাও মওকুফ করতে হবে। এ সময় খোতবা শ্রবণ করতে হবে। কোন কোন সাধারণ লোকের অভ্যাস এই, মুয়াযযিন আযান দিতে উঠলে তারা সেজদা করে। হাদীসে ও গুণীজন বাক্যে এর কোন ভিত্তি নেই। হযরত আলী ও হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি

চুপচাপ খোতবা শুনে তার জন্যে দুটি সওয়াব, যে খোতবা শুনে না এবং চুপ থাকে, তার জন্যে এক সওয়াব এবং যে শুনে বাজে কথা বলে, তার জন্যে দু'গোনাহ্ লেখা হয়। আর যেব্যক্তি শুনে না এবং বাজে কথা বলে, তার জন্যে এক গোনাহ্ লেখা হয় ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من قال لصاحبه والامام يخطب انصت اوصه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له ۔

অর্থাৎ, যেব্যক্তি ইমাম খোতবা পাঠ করার সময় সঙ্গীকে বলে ঃ চুপ থাক, সে বাজে কথা বলে। আর যে বাজে কথা বলে তার জুমআ হয় না।

এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল, ইশারা করে অথবা কংকর নিক্ষেপ করে চুপ করাতে হবে– কথা বলে নয়। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খোতবা পাঠ করছিলেন, তখন আমি উবাই ইবনে কাবকে প্রশ্ন করলাম, এ সূরা কবে নাযিল হয়েছিল। হযরত উবাই আমাকে চুপ থাকতে ইশারা করলেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বর থেকে নামার পর উবাই আমাকে বললেন ঃ যাও, তোমার জুমআ নেই। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেনঃ উবাই ঠিক বলেছে । যেব্যক্তি দূরে বসার কারণে খোতবা শুনতে অক্ষম, তার চুপ থাকা উচিত । হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ চার সময়ে নফল নামায মাকরূহ – ফজরের পরে, আসরের পরে, ঠিক দ্বিপ্রহরে এবং ইমাম যখন খোতবা দেন।

জুমআর নামায শেষ হলে কথা বলার পূর্বে সাত বার আলহামদু লিল্লাহ, সাত বার কুল হুয়াল্লাহু এবং সাত বার কুল আউযু সূরাদ্বয় পাঠ করবে। বর্ণিত আছে, যে এরূপ করবে সে এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় পাবে। জুমআর পরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব ঃ

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَغْنِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ ۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, হে অমুখাপেক্ষী, হে প্রশংসিত, হে প্রথমে সৃষ্টিকারী, হে পুনর্বার সৃষ্টিকারী, হে দয়ালু, হে প্রিয়, আমাকে আপনার হালাল রিযিক দ্বারা হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ব্যতীত সব কিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী করুন।

বর্ণিত আছে, কেউ যথারীতি এ দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্ট জীব থেকে বেপরওয়া করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক পৌছান। এর পর জুমআর পরবর্তী ছয় রাকআত নামায পড়বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে দু'রাকআত, চার রাকআত এবং ছয় রাকআত পড়ার বিভিন্ন রূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলো বিভিন্ন অবস্থায় দুরস্ত । অতএব ছয় রাকআত পড়লে সবগুলো রেওয়ায়েত পালিত হয়ে যাবে। জুমআ শেষে আসরের নামায পর্যন্ত মসজিদে থাকা উচিত । মাগরিব পর্যন্ত থাকলে আরও ভাল । বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জামে সমজিদে আসরের নামায পড়ে, সে হজ্জের সওয়াব পায় এবং যে মাগরিবের নামাযও পড়ে, সে হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পায় । যদি রিয়ার আশংকা থাকে অথবা মসজিদে অনর্থক কথাবার্তায় মশগুল হওয়ার ভয় হয়, তবে আল্লাহর যিকির করতে করতে এবং তাঁর নেয়ামতের কথা ভাবতে ভাবতে গৃহে ফিরে আসাই উত্তম। এর পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্তর ও মুখের হেফাযত করবে, যাতে জুমআর দিনের উৎকৃষ্ট মুহূর্তটি বিনষ্ট না হয়। জামে মসজিদে ও অন্যান্য মসজিদে দুনিয়ার কথাবার্তা বলা উচিত নয় । রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ এমন সময় আসবে, যখন মানুষ মসজিদসমূহে দুনিয়ার কথাবার্তা বলবে। তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার কোন সম্পর্কই নেই। তুমি তাদের কাছে বসো না ।

জুমআর দিনের অন্যান্য আদব

সকালে অথবা জুমআর নামাযের পরে অথবা আসরের পরে এলেমের মজলিসে উপস্থিত হবে। কিন্তু কিস্সাকথক ওয়ায়েদের মজলিসে যাবে না। তাদের কথাবার্তায় কোন কল্যাণ নেই। আখেরাতের পথিক জুমআর সমস্ত দিন দান খয়রাত ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করবে, যাতে উৎকৃষ্ট মুহূর্তটি হাতছাড়া না হয়। নামাযের পূর্বে কোন মজলিস

হলে তাতে যাওয়া উচিত নয়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমআর নামাযের পূর্বে হাল্‌কা তথা মজলিস করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন হক্কানী আলেম সকালে জামে মসজিদে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত ও শাস্তি বর্ণনা করে ওয়ায করলে তাঁর কাছে বসবে। এরূপ ওয়াজ শ্রবণ করা নফল এবাদত অপেক্ষা উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এলেমের মজলিসে হাজির হওয়া হাজার রাকআত নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ـ

নামাযান্তে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর।

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এতে দুনিয়া অন্বেষণ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং রোগীকে দেখা, জানাযায় শরীক হওয়া এবং এলেম শিক্ষা করা উদ্দেশ্য । আল্লাহ তাআলা কোরআন মজীদে কয়েক জায়গায় এলেমকে 'ফযল' তথা অনুগ্রহ বলেছেন। এক জায়গায় বলেছেন–

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ـ

অর্থাৎ, আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট। আরও বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ـ

অর্থাৎ, আমি দাঊদকে এলেম দান করেছি।

সুতরাং জুমআর দিনে এলেম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া উত্তম এবাদত। কিসসাকথকদের মজলিসে যাওয়া অপেক্ষা নামায উত্তম। কেননা, পূর্ববর্তীরা কিসসাকথন বেদআত মনে করতেন। তাঁরা কিসসা কথকদেরকে জামে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) জামে মসজিদে নিজের জায়গায় এসে দেখেন, জনৈক কিসসাকথক

সেস্থানে কিছু বর্ণনা করছে। তিনি বললেন ঃ আমার জায়গা থেকে উঠে যাও। সে বলল ঃ আমি উঠব না। আমি অগ্রে এখানে বসেছি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কোতোয়ালকে ডেকে তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করলেন। নিছক বয়ান করাই সুন্নত হলে তাকে বহিষ্কার করা কিরূপে জায়েয হত? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لا يقيمن احدكم اخاه من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا توسعوا ـ

তোমাদের কেউ যেন তার মুসলমান ভাইকে তার স্থান থেকে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে; বরং তোমরা সরে যাও এবং তাকে জায়গা দাও।

হযরত ইবনে ওমরের জন্যে কেউ নিজের স্থান ছেড়ে দিলে তিনি তাতে বসতেন না, যে পর্যন্ত সেই ব্যক্তি সেখানে না বসত। বর্ণিত আছে, জনৈক কিসসাকথক হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষের আঙ্গিনায় বসত। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বললেন ঃ লোকটি তার কিসসা দ্বারা আমাকে জ্বালাতন করছে। আমি যিকির ও তসবীহ করতে পারছি না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাকে এমন পিটুনি দিলেন যে, তার কোমরে একটি ছড়ি ভেঙ্গে ফেললেন।

জুমআর মধ্যে যে মুহূর্তটি উৎকৃষ্ট ও বরকতময়, তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। হাদীসে আছে, জুমআয় একটি মুহূর্ত আছে, যাতে কোন মুসলমান আল্লাহ তাআলার কাছে যা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। এ মুহূর্ত কোন্‌টি, তাতে মতভেদ আছে। যেমন, সূর্যোদয়ের সময়, নামাযে দাঁড়ানোর সময়, আসরের শেষ সময় এবং সূর্যাস্তের কিছু পূর্বেকার সময় ইত্যাদি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এ সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং খাদেমাকে বলতেন ঃ সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাক। যখন দেখ সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখন আমাকে খবর দাও। খাদেমা তাই করত। হযরত ফাতেমা এ সময় দোয়া ও এস্তেগফারে মশগুল হতেন। তিনি বলতেন ঃ এ মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকা উচিত। তিনি এটি তাঁর পিতার কাছ থেকে অবলম্বন করেছিলেন। কোন কোন

আলেম বলেন ঃ এ মুহূর্তটি সারা দিনের মধ্যে অনির্ধারিত। যেমন শবে কদর অনির্ধারিত, যাতে বশী পরিমাণে এর অপেক্ষা করা হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ এ মুহূর্তটি জুমআর দিনের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন শবে কদর পরিবর্তিত হতে থাকে। এ উক্তি অধিক সঙ্গত। হযরত কা'ব আহবার (রঃ) বলেন ঃ এটি জুমআর দিনের শেষ মুহূর্ত; অর্থাৎ, সূর্যাস্তের সময়। একথা শুনে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন ঃ শেষ মুহূর্ত কিরূপে হতে পারে? আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এ মুহূর্তটি নামায পড়া অবস্থায় পায়। দিনের শেষ মুহূর্ত তো নামাযের সময় নয়। কা'ব (রঃ) বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কি একথা বলেননি, যেব্যক্তি বসে নামাযের অপেক্ষা করে সে নামাযেই থাকে? আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন ঃ হাঁ, বলেছেন। কা'ব বললেন ঃ কাজেই এটাও নামাযের সময়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। হযরত কা'ব আরও বলতেন, এ মুহূর্তটি আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের জন্যে, যারা এদিনের হকসমূহ আদায় করে। সুতরাং এ রহমত তখন হওয়া উচিত, যখন হক আদায় সমাপ্ত হয়। মোট কথা, এ সময় এবং ইমামের মিম্বরে আরোহণের সময় উভয়টি উৎকৃষ্ট। উভয় সময়ে দোয়া করা উচিত।

জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করবে। তিনি বলেন ঃ যে কেউ জুমআর দিনে আমার প্রতি আশি বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার আশি বছরের গোনাহ মাফ করে দেবেন। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা কিরূপে দরূদ প্রেরণ করব? তিনি বললেন ঃ এভাবে বল–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ -

হে আল্লাহ, রহমত প্রেরণ কর তোমার বান্দা, নবী, রসূল ও উম্মী নবী মুহাম্মদের প্রতি।

এটা একবার হল। এমনিভাবে আশি বার পূর্ণ কর। এ ছাড়া অন্য যেকোন দরূদ পাঠ করলে এমনকি তাশাহহুদের দরূদ পাঠ করলেও তাকে দরূদ পাঠকারী বলা হবে। দরূদের সাথে এস্তেগফারও করা উচিত। জুমআর দিন এস্তেগফার করাও মোস্তাহাব।

জুমআর দিন অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করবে। বিশেষ করে সূরা কাহফ পাঠ করবে। হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জুমআর দিন অথবা তার রাতে সূরা কাহফ পাঠ করে, তাকে তার পড়ার স্থান থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত নূর দান করা হয় এবং দ্বিতীয় জুমআ ও আরও তিন দিনের মাগফেরাত করা হয়। সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে। সে ব্যথা, পেটের ফোড়া, বাত, কুষ্ঠ এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকে। সম্ভব হলে জুমআর দিনে অথবা রাত্রে কোরআন খতম করা মোস্তাহাব। এতে অনেক সওয়াব রয়েছে।

জামে মসজিদে প্রবেশ করে চার রাকআত না পড়া পর্যন্ত বসবে না। এর প্রত্যেক রাকআতে পঞ্চাশ বার করে সূরা এখলাস পাঠ করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি এ আমল করবে, সে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নেবে। তাহিয়্যাতের দু'রাকআতও পড়তে ভুল করবে না, যদিও ইমাম খোতবা দিতে থাকে। এমতাবস্থায় দ্রুত পড়ে নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিকে তাই করতে আদেশ করেছেন। মোট কথা, জুমআর দিন সময় এভাবে বন্টন করা উচিত– সকাল থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত নামাযের জন্যে, জুমআর পর থেকে আসর পর্যন্ত এলেম শোনার জন্যে এবং আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তসবীহ ও এস্তেগফারের জন্যে।

জুমআর দিনে দান-খয়রাত করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত, এমন ব্যক্তিকে দেবে না যে ইমামের খোতবার সময় দানের আবেদন করে এবং ইমামের কথা বলার সঙ্গে কথা বলে। এরূপ ব্যক্তিকে দান করা মাকরূহ। ইমাম আহমদের পুত্র সালেহ বলেন ঃ জুমআর দিন জনৈক মিসকীন ইমামের খোতবা পাঠের সময় দানের আবেদন করল। সে আমার পিতার বরাবর ছিল। জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে এক খন্ড রৌপ্য দিল মিসকীনকে দেয়ার জন্যে। আমার পিতা তা গ্রহণ করলেন না। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে যায়, তাকে ভিক্ষা দেয়া কতক আলেমের মতে মাকরূহ; কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অথবা বসে চাইলে দেয়ায় দোষ নেই।

কা'ব আহবার (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর জন্যে আসে, এর পর ফিরে গিয়ে দু'প্রকার বস্তু খয়রাত করে, পুনরায় মসজিদে এসে পূর্ণ রুকু সেজদা সহকারে দু'রাকআত নফল নামায পড়ে এই দোয়া করে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ -

অর্থাৎ, এরপর সে যেকোন দোয়া করবে, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন। জুমআর দিনকে আখেরাতের জন্যে নির্দিষ্ট করবে। এতে দুনিয়ার কোন কাজ করবে না। বেশী পরিমাণে ওযিফা পাঠ করবে এবং এদিন সফর শুরু করবে না। বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জুমআর রাত্রে সফর করে, তার উভয় ফেরেশতা তার জন্যে বদ দোয়া করে। জুমআর ফজরের পরে তো সফর নিষিদ্ধই, যদি কাফেলা চলে না যায়।

সারকথা, জুমআর দিনে ওযিফা পাঠ ও দান-খয়রাত বেশী করে করবে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন তার কাছ থেকে ভাল সময়ে ভাল কাজ নেন। আর যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন, তখন তার কাছ থেকে ভাল সময়ে খারাপ কাজ নেন, যাতে এ খারাপ কাজ তাঁর আযাব আরও বাড়িয়ে দেয়।

নামাযের বিবিধ মাসআলা

০ অল্প কর্ম দ্বারা নামায বাতিল হয় না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে অল্প কর্মও মাকরূহ। প্রয়োজন এই ঃ সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তিকে সরিয়ে দেয়া, বিচ্ছু দংশন করবে বলে আশংকা হলে সেটিকে এক অথবা দুই আঘাতে মেরে ফেলা এবং অপরিহার্য হলে শরীর চুলকানো। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) উকুন ও মাছি নামাযের মধ্যে ধরে ফেলতেন এবং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) উকুন মেরে ফেলতেন। হাই তোলার সময় মুখে হাত রাখা উত্তম। নামাযে অল্প কর্ম থেকেও বিরত থাকা পূর্ণতার স্তর। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ নামাযে শরীর থেকে মাছি সরাতেন না এবং বলতেন ঃ আমি নিজেকে এ বিষয়ে অভ্যস্ত করি না।

০ নামাযে থুথু নিক্ষেপ করলে নামায বাতিল হবে না। কারণ, এটা

অল্প কর্ম। থুথুর কারণে আওয়াজ সৃষ্টি না হলে তাকে কালাম গণ্য করা হবে না। এতদসত্ত্বেও নামাযে থুথু নিক্ষেপ করা মাকরূহ। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে থুথু নিক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন, সেভাবে থুথু নিক্ষেপ করা মাকরূহ নয়। সেমতে জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার মসজিদে থুথু দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এর পর তিনি খেজুরের একটি ডাল দ্বারা থুথু ঘষে দিলেন এবং সামান্য জাফরান এনে সেখানে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করা হোক? সকলেই বলল ঃ এটা কেউ পছন্দ করে না। তিনি বললেন ঃ তোমরা যখন নামাযে প্রবেশ কর, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও কেবলার মাঝখানে থাকেন। কতক রেওয়ায়েতে আছে– তোমাদের সামনে থাকেন। অতএব সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করা উচিত নয়; ডান দিকেও উচিত নয়; বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করবে। (এটা মসজিদের বাইরে নামায পড়লে।) বেগতিক হলে নিজের কাপড়ে থুথু নিক্ষেপ করবে এবং কাপড়টি ঘষে দেবে।

০ মুক্তাদীর দন্ডায়মান হওয়ার সুন্নত তরীকা এই, মুক্তাদী একজন হলে ইমামের ডান দিকে সামান্য পেছনে সরে দাঁড়াবে। একা ব্যক্তি কাতারের পেছনে দাঁড়াবে না; বরং হয় কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়বে; না হয় কাতার থেকে কাউকে নিজের সাথে টেনে নেবে। যদি একাই দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার নামায মাকরূহ হবে।

০ যেব্যক্তি পরবর্তী রাকআতসমূহে ইমামের সাথে শরীক হয়, তাকে মসবুক বলা হয়। মসকবুক যে রাকআতে শরীক হয়, সে রাকআতই তার নামাযের শুরু। ইমাম নামায শেষ করলে এর উপর ভিত্তি করে সে অবশিষ্ট নামায পড়ে নেবে। তকবীরে তাহরীমার পর রুকুর তকবীর বলে যদি ইমামকে রুকুতে পাওয়া যায় এবং তার সাথে স্থিরভাবে রুকু করা যায়, তবে সেই রাকআত পাওয়া গেল বলে ধরতে হবে। যদি ইমামের সাথে সস্থিরে রুকু করার পূর্বেই ইমাম রুকু থেকে উঠে পড়ে, তবে সেই রাকআত ফওত হয়ে গেল বলে ধরতে হবে। যদি ইমামকে সেজদায় অথবা তাশাহহুদে পাওয়া যায়, তবে মসবুক ব্যক্তি কেবল তকবীরে

তাহরীমা বলে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে– পরবর্তী তকবীর বলবে না।

০ যেব্যক্তি নামায পড়ার পর নিজের কাপড়ে নাপাকী দেখে, তার জন্য পুনরায় নামায পড়া মোস্তাহাব। নামাযের অভ্যন্তরে নাপাকী দেখলে নাপাক কাপড় পৃথক করে ফেলবে এবং নামায পূর্ণ করে নেবে। তবে নতুন করে নামায পড়া মোস্তাহাব। একবার জিবরাঈল এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নামাযের মধ্যে খবর দিলেন, আপনার জুতায় নাপাকী লেগে আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ জুতা খুলে ফেললেন, কিন্তু নতুনভাবে নামায পড়েননি।

০ রুকু, সেজদা ও অন্যান্য আমলে ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া মুক্তাদীর পক্ষে জায়েয নয়। এমনিভাবে এসব কাজ ইমামের সাথে সাথে করাও উচিত নয়; বরং এসব কাজে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে এবং পরে আদায় করবে। এক্তেদার অর্থ এটাই। যদি ইচ্ছাপূর্বক ইমামের সাথে সাথে এসব কাজ করে, তবে নামায বাতিল হবে না। যেমন, ইমামের সমান সমান দাঁড়ালে নামায বাতিল হয় না। সুতরাং কেউ ইমামের আগে রোকন আদায় করলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

ما يخشى الذى يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি ইমামের পূর্ব (সেজদা থেকে) মাথা উত্তোলন করে, সে কি ভয় করে না, আল্লাহ তাআলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দেবেন?

ইমাম থেকে এক রোকন পেছনে থাকা নামায বাতিল করে না। উদাহরণতঃ ইমাম রুকু থেকে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু মুক্তাদী এখনও রুকু করল না। তবে এতটুকু পেছনে থাকা মাকরূহ । যদি ইমাম সেজদায় মাথা রেখে দেয় এবং মুক্তাদী তখনও রুকুতে না যায়, তবে মুক্তাদীর নামায বাতিল হয়ে যাবে।

যেব্যক্তি নামাযে উপস্থিত হয়, সে অন্য ব্যক্তিকে নামাযে খারাপ কিছু করতে দেখলে তা থেকে বারণ করার অধিকার রাখে। কোন মূর্খ ব্যক্তি

এরূপ করলে তাকে নম্রভাবে শিখিয়ে দেবে, যেমন কাতার সোজা করা, একা ব্যক্তি কাতারের পেছনে দাঁড়ালে তাকে নিষেধ করা, ইমামের পূর্বে মাথা উত্তোলন করলে তাকে মানা করা। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি কাউকে খারাপভাবে নামায পড়তে দেখে নিষেধ করে না, সে গোনাহে তার সাথে শরীক হবে। বেলাল ইবনে সাদ বলেন ঃ গোপনে ত্রুটি করলে যে করে সে-ই দায়ী হবে; কিন্তু প্রকাশ্য ত্রুটির সংশোধন কেউ না করলে তার ক্ষতি ব্যাপক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, হযরত বেলাল (রাঃ) নামাযের কাতার সোজা করতেন এবং মুসল্লীদের পায়ের ঘিঁটে দোররা মারতেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ নামাযে তোমার ভাইদের খোঁজ কর। যদি তাদেরকে না দেখ, তবে রুগ্ন হলে দেখতে যাও এবং সুস্থ হলে জামাআত তরক করার কারণে তিরস্কার কর। মসজিদে প্রবেশ করে কাতারের ডান দিকে যাওয়া উচিত। রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমলে ডান দিকে এত বেশী লোক থাকত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বাম দিক উপেক্ষিত হওয়ার অভিযোগ পেশ করা হল। ফলে তাকে বলতে হল ঃ যেব্যক্তি মসজিদের বাম দিক আবাদ করবে, তার দুটি সওয়াব হবে। কাতারে কোন নাবালেগ ছেলেকে দেখলে তাকে সরিয়ে বয়স্ক ব্যক্তি তার স্থলে দাঁড়াতে পারে।
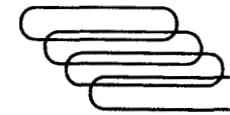
সপ্তম পরিচ্ছেদ

নফল নামায

প্রকাশ থাকে যে, ফরয ছাড়া আরও তিন প্রকার নামায রয়েছে– সুন্নত, মোস্তাহাব ও তাতাব্বু (تطوع)। সুন্নত নামায বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সেসব নামায, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়মিতভাবে পাঠ করেছেন; যেমন ফরয নামাযসমূহের পরবর্তী সুন্নত নামাযসমূহ, চাশতের নামায ও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি । যে পথে চলা হয়েছে, তাকে বলা হয় সুন্নত । অতএব রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে পথে নিয়মিত চলেছেন, তাই হবে সুন্নত। মোস্তাহাব বলে আমাদের উদ্দেশ্য সেই নামায, যার মাহাত্ম্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে তা নিয়মিত পড়া বর্ণিত নেই। যেমন, গৃহ থেকে বের হওয়া ও গৃহে আগমনের সময়কার নামায। তাতাব্বু বলে আমরা সেই নামায বুঝিয়েছি, যা সুন্নত ও মোস্তাহাবের আওতায় পড়ে না; অর্থাৎ এ নামাযের পক্ষে বিশেষ কোন হাদীস নেই। কিন্তু বান্দা আল্লাহর সাথে মোনাজাতে উৎসাহী হয়ে এ নামায পড়ে। এই তিন প্রকার নামাযকেই নফল নামায বলা হয় । কেননা, নফল শব্দের অর্থ অতিরিক্ত । বলাবাহুল্য, এই তিন প্রকার নামায ফরযের অতিরিক্ত । এসব উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য আমরা উপরোক্ত তিনটি পরিভাষা নির্দিষ্ট করেছি। কেউ এই পরিভাষা বদলে দিতে চাইলে তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কেননা, উদ্দেশ্য বুঝে নেয়ার পরে শব্দের কোন গুরুত্ব থাকে না।

উপরোক্ত প্রকারত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এসব স্তরের মর্যাদায়ও পার্থক্য রয়েছে। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিয়মিত পড়ার মধ্যে এবং এগুলোর হাদীসের মধ্যেও সহীহ্ ও মশহুরের পার্থক্য রয়েছে। এর ভিত্তিতেই আমরা বলি, জামাআতের সুন্নতসমূহ একান্তের সুন্নত অপেক্ষা উত্তম। জামাআতের সুন্নতসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ঈদের নামায, এর পর সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায, এর পর বৃষ্টির জন্য নামায। একান্তের সুন্নতসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে বেতেরের নামায, এর পর ফজরের সুন্নত, এর পর অন্যান্য নামাযের সুন্নত।

প্রকাশ থাকে যে, নফল নামাযসমূহ দু'প্রকার– (১) কারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত; যেমন, সূর্যগ্রহণ ও বৃষ্টির নামায এবং (২) সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত । সময়ের পুনরাবৃত্তির সাথে সাথে এসব নফল নামাযেরও পুনরাবৃত্তি হয়। এই প্রকার নফল আটটি– পাঞ্জেগানা নামাযসমূহের নফল নামায পাঁচটি এবং তিনটি হচ্ছে চাশতের নামায, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নফল নামায এবং তাহাজ্জুদের নামায।

(১) পাঞ্জেগানা নামাযের মধ্যে ফজরের সুন্নত দু'রাকআত। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ –

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ـ

ফজরের দু'রাকআত দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু অপেক্ষা উত্তম। এর সময় সোবহে সাদেক থেকে শুরু হয়ে যায়। আকাশের কিনারায় ফজরের পূর্বে বিস্তৃত শুভ্র রেখাকে সোবহে সাদেক বলা হয়। শুরুতে এটা চেনা খুবই কঠিন। এর জন্যে চন্দ্রের উদয় অস্তের সময় জানতে হবে। প্রতি মাসে দু'বার চন্দ্র দ্বারা সোবহে সাদেক চেনা যায়। ছাব্বিশতম রাতে চাঁদ সোবহে সাদেকের সাথে উদিত হয় এবং দ্বাদশতম রাতে চাদের অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে প্রায় সোবহে সাদেক হয়ে যায়। যে আখেরাত তলব করে, তার জন্যে চাঁদের এসব মনযিল চেনা জরুরী। এতে রাত্রিকালীন সময়ের পরিমাণ ও সোবহে সাদেক চেনা যায়। যখন ফজরের ফরয সময় শেষ হয়, তখন সুন্নতের সময়ও শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের সময় এসব নামায পড়া যায় না। ফরযের পূর্বে এ দু'রাকআত পড়া সুন্নত। মসজিদে আসার পর যদি ফরযের তকবীর হয়ে যায়, তবে ফরয নামাযেই শামিল হয়ে যাবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اذا قضيت الصلوة فلا صلوا المكتوبة ـ

'নামাযের তকবীর হয়ে গেলে ফরয ছাড়া কোন নামায পড়া যাবে না।' ফরয নামায শেষ হলে সুন্নত পড়ে নেবে। সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়লে তাও আদায় হবে। কেননা, সময়ের মধ্যে সুন্নত ফরযের অনুগামী। তবে জামাআত ফওত না হলে এ সুন্নত ফরযের পূর্বে পড়া সুন্নত। মোস্তাহাব এই, এ সুন্নত গৃহে সংক্ষেপে পড়ে মসজিদে যাবে এবং দু'রাকআত

তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে বসে যাবে। ফরয পড়া পর্যন্ত কোন নামায পড়বে না। এর পর সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকবে।

(২) যোহরের সুন্নত ছয় রাকআত। ফরযের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দু'রাকআত। এ দু'রাকআত সুন্নতে মোআক্কাদা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, যেব্যক্তি সূর্য ঢলে পড়ার পর চার রাকআত নামায পড়ে এবং তার কেরাআত, রুকু ও সেজদা ভালরূপে করে, তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায পড়ে এবং রাত্রি পর্যন্ত তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে।

(৩) আসরের পূর্বে চার রাকআত নফল নামায। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

رحم الله عبدا صلى قبل العصر اربعا ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন যে আসরের পূর্বে চার রাকআত পড়ে।

সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় দাখিল হওয়ার আশা নিয়ে এই চার রাকআত পড়া মোস্তাহাব। তিনি যোহরের দু'রাকআতের অনুরূপ নিয়মিতভাবে আসরের এই চার রাকআত পড়েননি।

(৪) মাগরিবের ফরযের পর দু'রাকআত সুন্নত। এক্ষেত্রে একটি ভিন্ন রেওয়ায়েত উবাই ইবনে কাব, ওবাদা ইবনে সামেত, আবু যর, যায়দ ইবনে সাবেত প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, মাগরিবের ফরযের পূর্বে আযান ও একামতের মাঝখানে দু'রাকআত দ্রুত পড়ে নেয়া উচিত। কোন কোন সাহাবী বলেন ঃ আমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত পড়তাম। ফলে নতুন আগন্তুক মনে করত, আমরা মাগরিব পড়ে নিয়েছি। এটা আসলে এই হাদীসের ব্যাপকতার মধ্যে দাখিল– بين كل اذانين صلوة لمن شاء প্রত্যেক দু'আযান অর্থাৎ, আযান ও একামতের মধ্যে নামায রয়েছে। যে চায় সে পড়ুক। হযরত ইমাম আহমদ (রহঃ) এই দু'রাকআত পড়তেন। কিন্তু লোকেরা এজন্যে তাঁর সমালোচনা শুরু করলে তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

(৫) এশার ফরযের পর চার রাকআত সুন্নত। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার পর চার রাকআত পড়ে শুয়ে পড়তেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ নামায একটি সুরক্ষিত কল্যাণ। যার ইচ্ছা কম নিক এবং যার ইচ্ছা বেশী নিক। এ থেকে জানা গেল, প্রত্যেকেই নফল নামায ততটুকু অবলম্বন করবে, যতটুকু তার কল্যাণের প্রতি আগ্রহ থাকে। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রকাশ পেয়েছে, নফলসমূহের মধ্যে কতক অধিক মোআক্কাদ (জোরদার) এবং কতক কম মোআক্কাদ। সুতরাং অধিক মোআক্কাদ নফল ছেড়ে দেয়া মোটেই সমীচীন নয়। কেননা, নফল নামায ফরযের জন্যে পরিপূরক হয়ে থাকে। কাজেই নফল বেশী না পড়লে ফরয ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়।

(৬) বেতেরের নামায। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার পরে তিন রাকআত বেতের পড়তেন। প্রথম রাকআতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى দ্বিতীয় রাকআতে কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা এখলাস পাঠ করতেন। এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেতেরের পর দু'রাকআত বসে বসে পড়তেন এবং নিদ্রার পূর্বে দু'রাকআত পড়তেন। প্রথম রাকআতে সূরা যিলযাল এবং দ্বিতীয় রাকআতে তাকাসুর পাঠ করতেন। রাত্রিকালীন নফল নামাযের শেষে বেতের পড়া উত্তম। সুতরাং তাহাজ্জুদের পরে বেতের পড়া ভাল।

(৭) চাশতের নামায নিয়মিত পড়া একটি উত্তম আমল। এর সংখ্যা সর্বোচ্চ আট রাকআত বর্ণিত আছে। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) চাশতের নামায আট রাকআত পড়েছেন এবং খুব দীর্ঘ করে ও উত্তমরূপে পড়েছেন। এ সংখ্যা অন্য কোন রাবী বর্ণনা করেননি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) চাশতের নামায নিয়মিতভাবে চার রাকআত পড়েছেন এবং মাঝে মাঝে বেশীও পড়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বেশীর সীমা উল্লেখ করেননি। এ থেকে জানা যায়, তিনি চার রাকআত নিয়মিত পড়তেন– এর কম পড়তেন না এবং মাঝে মাঝে বেশীও পড়তেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাশতের নামায ছয় রাকআত দু'ওয়াক্তে পড়তেন।

উদয়ের পর সূর্য যখন সামান্য উপরে উঠতো, তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকআত পড়তেন। এরপর যখন সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়তো এবং সূর্য আকাশের পূর্ব প্রান্তে থাকত, তখন চার রাকআত পড়তেন। মোট কথা, সূর্য যখন অর্ধ বর্শা পরিমাণ উপরে উঠত, তখন দু'রাকআত পড়তেন এবং সূর্য যথেষ্ট উপরে উঠার পর চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং চাশতের সময় এভাবে নির্ণীত হবে, সূর্যোদয় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত মোট সময়ের অর্ধেক হলে চাশত পড়া উচিত; যেমন সূর্য ঢলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট সময়ের অর্ধাংশের সময় আসরের নামায পড়া হয়। অতএব আসরের সময়ের বিপরীত সময় হচ্ছে চাশতের সময়। এ সময়টি চাশতের উত্তম সময়। নতুবা সূর্য উপরে উঠার পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন সময় চাশত পড়া যায়।

(৮) মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নফল নামাযও সুন্নতে মোআক্কাদা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্ম দ্বারা এর রাকআত সংখ্যাদ্বয় বর্ণিত আছে। এ নামাযের সওয়াব অনেক। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (তাদের পার্শ্ব নিদ্রার স্থান থেকে আলাদা থাকে।) আয়াতে ঐ নামাযই বুঝানো হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে মাগরিব ও এশার মাঝখানে নামায পড়ে, তার এ নামায আল্লাহর দিকে রুজুকারীদের নামায। তিনি আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি মাগরিব ও এশার মাঝখানে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ রাখে এবং নামায ও কোরআন পাঠ ছাড়া অন্য কোন আলাপ-আলোচনা না করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাতে দুটি প্রাসাদ তৈরী করেন, যা পরস্পরের একশ' বছরের দূরত্বে অবস্থিত। তার জন্যে উভয় প্রাসাদের মধ্যস্থলে এত বৃক্ষ রোপণ করেন, দুনিয়ার সকল বাসিন্দা তাতে ঘুরাফেরা করতে চাইলে তাদের জন্যে স্থান সংকুলান হবে।

এর পর আসে সপ্তাহের দিন ও রাত্রির নফল নামায। দিনের মধ্যে আমরা প্রথমে রবিবার থেকে শুরু করছি। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি রবিবার দিন চার রাকআত পড়ে এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আমানার রাসূলু একবার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে খৃস্টান পুরুষ ও খৃস্টান

নারীর সমসংখ্যক সওয়াব লেখবেন। তাকে একজন নবীর সওয়াব দেবেন এবং এক হজ্জ ও ওমরা তার জন্যে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রত্যেক রাকআতের বদলে হাজার নামাযের সওয়াব লেখবেন। প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে জান্নাতে একটি মেশকের শহর দেবেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ রবিবার দিন অধিক নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার একত্ব ঘোষণা কর। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। অতএব যেব্যক্তি রবিবার দিন যোহরের ফরয ও সুন্নতের পর চার রাকআত পড়ে, প্রথম রাকআতে আলহামদু ও আলিফ লাম সেজদা এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা মুলক পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতঃ সালাম ফেরায়, এর পর দাঁড়িয়ে আরও দু'রাকআত পড়ে, প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতেও এ সূরাই পড়ে, এর পর আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করে, আল্লাহ তাআলার জন্যে তার প্রয়োজন মেটানো অপরিহার্য হয়ে যাবে।

সোমবার– হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সোমবার দিন সূর্য উপরে উঠার পর দু'রাকআত পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার, আয়াতুল কুরসী একবার, এখলাস, ফালাক ও নাস একবার পাঠ করে এবং সালামের পর দশ বার এস্তেগফার ও দশ বার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার সকল গোনাহ মাফ করে দেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সোমবার দিন বার রাকআত পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আয়াতুল কুরসী এক একবার এবং নামায শেষে সূরা এখলাস ও এস্তেগফার বার বার পড়ে, তাকে কেয়ামতের দিন অমুকের পুত্র অমুক কোথায়, উঠ এবং তোমার সওয়াব নাও, বলে আহবান করা হবে। অতঃপর প্রথম সওয়াবস্বরূপ তাকে এক হাজার বেহেশতী পোশাক দেয়া হবে। তার মাথায় মুকুট রাখা হবে। তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। তখন এক হাজার ফেরেশতা তার অভ্যর্থনার জন্যে পৃথক পৃথক উপঢৌকন নিয়ে আগমন করবে এবং তার সাথে সাথে থাকবে।

মঙ্গলবার– হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মঙ্গলবার দিন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে দশ

রাকআত পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, আয়াতুল কুরসী এক একবার এবং সূরা এখলাস তিন বার পাঠ করে, তার সত্তর দিনের গোনাহ লেখা হবে না। সত্তর দিনের মধ্যে সে মারা গেলে শহীদের মর্তবা নিয়ে মারা যাবে এবং তার সত্তর বছরের গোনাহ মার্জনা করা হবে।

বুধবার– হযরত মুআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বুধবারে দ্বিপ্রহরের পূর্বে বার রাকআত নামায পড়ে এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আয়াতুল কুরসী এক একবার, সূরা এখলাস তিন বার এবং সূরা ফালাক ও নাস তিন বার পাঠ করে, তাকে আরশের কাছ থেকে ফেরেশতারা ডাক দিয়ে বলে ঃ হে আল্লাহর বান্দা আবার আমল কর। তোমার পূর্ব গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহ তাআলা তার কবরের অন্ধকার ও সংকীর্ণত। কেয়ামতের কঠোরতা দূরীভূত করে দেবেন। সেদিন থেকেই তার জন্যে একজন পয়গম্বরের আমল উপরে উঠতে থাকবে।

বৃহস্পতিবার– হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বৃহস্পতিবার দিন যোহর ও আসরের মধ্যে দু'রাকআত নামায পড়ে, প্রথম রাকআতে আলহামদু একবার, আয়াতুল কুরসী একশ' বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা এখলাস একশ' বার এবং দরূদ একশ' বার পাঠ করে, তাকে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির সওয়াব দান করবেন, যে রজব, শাবান ও রমযানের রোযা রাখে। তাকে হজ্জের সমান সওয়াব দান করা হবে। আল্লাহ তাআলা তার জন্যে মুমিন ও তাওয়াক্কুলকারীদের সংখ্যা পরিমাণে সওয়াব লেখবেন।

শুক্রবার– হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ জুমআর দিন একটি নামায আছে। যে মুমিন বান্দা সূর্য পূর্ণরূপে উদিত হওয়ার পর পূর্ণরূপে ওযু করে ঈমান ও সওয়াবের আশায় চাশতের দু'রাকআত নামায পড়ে, তার জন্যে আল্লাহ তাআলা দুশ' নেকী লেখেন এবং দুশ' গোনাহ মার্জনা করেন। যে চার রাকআত পড়ে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার চারশ' মর্তবা উঁচু করে দেন। যে আট রাকআত পড়ে, তার আটশ' মর্তবা উঁচু করেন এবং সকল গোনাহ মাফ করে দেন। আর যে বার রাকআত পড়ে, তার জন্যে বারশ' নেকী লিপিবদ্ধ করেন, বারশ'

কুকর্ম তার আমলনামা থেকে দূর করে দেন এবং জান্নাতে বারশ' মর্তবা উঁচু করেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন জামে মসজিদে প্রবেশ করে এবং জুমআর পূর্বে চার রাকআত নামাযে প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা এখলাস পঞ্চাশ বার পাঠ করে, সে মৃত্যুর সময় জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নেবে অথবা তাকে দেখিয়ে দেয়া হবে।

শনিবার– হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি শনিবার দিন চার রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার ও সূরা কাফিরূন তিন বার এবং নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে প্রত্যেক অক্ষরের বদলে এক হজ্জ ও এক ওমরার সওয়াব লেখেন, এক বছরের দিনের রোযা ও রাতের এবাদতের সওয়াব দান করেন, এক শহীদের সওয়াব দেন এবং কেয়ামতে পয়গম্বর ও শহীদগণের সাথে আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন।

এখন রাত্রিসমূহের অবস্থা শুনা উচিত।

রবিবার রাত্রি– হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যেব্যক্তি রবিবার রাতে কুড়ি রাকআত নামায পড়ে– প্রত্যেক রাকআতে আলহামদুর পর সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস একবার পাঠ করে নিজের পিতামাতার জন্যে একশ' বার মাগফেরাতের দোয়া করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি একশ' বার দরূদ প্রেরণ করে, নিজের শক্তি থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর শক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করে, অতঃপর বলে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ اٰدَمَ صَفْوَةُ اللّٰهِ وَفِطْرَتُهٗ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَمُوْسٰى كَلِيْمُ اللّٰهِ وَعِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ وَمُحَمَّدً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيْبُ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই, আদম আল্লাহর মনোনীত ও তাঁর ফিতরত, ইবরাহীম আল্লাহর খলীল, মূসা আল্লাহর সাথে বাক্যালাপকারী, ঈসা

আল্লাহর রূহ এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর হাবীব। সে তাদের সংখ্যা পরিমাণে সওয়াব পাবে, যারা আল্লাহ তাআলার সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে এবং যারা তা বিশ্বাস করে না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে শান্তিপ্রাপ্তদের সাথে উত্থিত করবেন এবং জান্নাতে পয়গম্বরগণের দলভুক্ত করবেন।

সোমবার রাত্রি– হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সোমবার রাতে চার রাকআত নামায পড়ে– প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস দশ বার, দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস কুড়ি বার, তৃতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস ত্রিশ বার এবং চতুর্থ রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস চল্লিশ বার পাঠ করে, এর পর সালাম ফিরিয়ে পঁচাত্তর বার সূরা এখলাস পড়ে নিজের ও পিতামাতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা আল্লাহ তাআলা নিজের উপর জরুরী করে নেন। এ নামাযকে সালাতে হাজত বলা হয়।

মঙ্গলবার রাত্রি– এ রাতে দু'রাকআত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, এখলাস, ফালাক ও নাস প্রতিটি পনর বার, সালামের পর আয়াতুল কুরসী পনর বার এবং এস্তেগফার পনর বার পাঠ করবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মঙ্গলবার রাতে দু'রাকআত নামায পড়ে– প্রত্যেক রাকআতে একবার আলহামদু, সূরা কদর এবং এখলাস সাত সাত বার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন এবং কেয়ামতের দিন এ নামায তাকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করবে।

বুধবার রাত্রি– হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বুধবার রাতে তিন সালাম সহকারে ছয় রাকআত নামায পড়ে– প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু লিল্লাহর পর قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ থেকে দু'আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে এবং নামাযান্তে বলে جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ (আল্লাহ মুহাম্মদকে আমাদের পক্ষ থেকে যোগ্য প্রতিদান দিন।) –আল্লাহ তার

সত্তর বছরের গোনাহ ক্ষমা করবেন এবং তার জন্যে দোযখ থেকে পরিত্রাণপত্র লেখে দেবেন। আরও বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি বুধবার রাতে দু'রাকআত নামায পড়ে– প্রথম রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা ফালাক দশ বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদুর পর সূরা নাস দশ বার, সালামের পর দশ বার এস্তেগফার এবং দশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার সওয়াব লেখার জন্যে প্রত্যেক আকাশ থেকে সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার সওয়াব লেখতে থাকে।

বৃহস্পতিবার রাত্রি– হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে বৃহস্পতিবার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে দু'রাকআত নামায পড়ে– প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু পাঁচ বার, আয়াতুল কুরসী পাঁচ বার, এখলাস পাঁচ বার, পাঁচ পাঁচ বার ফালাক ও নাস এবং নামাযান্তে পনর বার এস্তেগফার পাঠ করে, তার সওয়াব পিতামাতাকে বখশে দেয়, পিতামাতার হক তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, যদিও সে পিতামাতার অবাধ্যতা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে এমন বস্তু দেবেন, যা সিদ্দীক ও শহীদগণকে দেবেন।

শুক্রবার রাত্রি– হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে শুক্রবার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে বার রাকআত নামায আদায় করে– প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার এবং এখলাস এগার বার পাঠ করে, সে যেন আল্লাহ তাআলার এবাদত বার বছর পর্যন্ত এভাবে করল, দিনের বেলায় রোযা রাখল এবং রাতে নফল নামায পড়ল। হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে শুক্রবার রাতে জামাআতের সাথে এশার নামায পড়ে, উভয় সুন্নত পড়ে এবং ফরয ও সুন্নতের পর দশ রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, এখলাস, ফালাক ও নাস এক এক বার পাঠ করতঃ বেতেরের তিন রাকআত পড়ে এবং ডান পার্শ্বে কেবলামুখী হয়ে শুয়ে থাকে, সে যেন সমগ্র রাত্রি নফল নামায পড়ল। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ উজ্জ্বল দিনে আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ কর অর্থাৎ শুক্রবার রাত্রি ও দিনে।

শনিবার রাত্রি– হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)

বলেন ঃ যে শনিবার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে বার রাকআত নামায পড়ে, তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। সে যেন প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীকে খয়রাত বন্টন করল। তাকে ক্ষমা করা আল্লাহ নিজের জন্যে জরুরী করে নেন।

চার প্রকার নফল নামায প্রতিবছর একবার করে আদায় করতে হয়– (১) দু'ঈদের নামায, (২) তারাবীহ, (৩) রজবের নামায ও (৪) শা'বানের নামায। দু'ঈদের নামায –এই নামায সুন্নতে মোআক্কাদা তথা ওয়াজিব। এটি ধর্মের একটি নিদর্শন। এতে সাতটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম, তিন বার তকবীর অর্থাৎ নিম্নোক্ত বাক্যাবলী বলা ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ - وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ -

অর্থাৎ, আল্লাহ মহান, আল্লাহর জন্যে অনেক প্রশংসা। সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্যে এবাদতকে খাঁটি কর; যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।

ঈদুল ফেতরের রাত্রি থেকে ঈদের নামায পর্যন্ত এ তকবীরের সময়। ঈদুল আযহায় এ তকবীর ৯ তারিখের ফজর থেকে শুরু করবে এবং ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত চলবে। এতে মতভেদও আছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উক্তি এটাই। নামাযসমূহের পরে এ তকবীর বলতে হবে; কিন্তু ফরয নামাযের পরে পড়ার উপর জোর বেশী।

দ্বিতীয়, ঈদের দিনের সকালে গোসল করবে, সাজগোজ করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে। পুরুষদের জন্যে চাদর ও পাগড়ী উত্তম।

তৃতীয়, এক পথে ঈদগাহে যাবে এবং অন্য পথে ফিরে আসবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করেছেন। তিনি যুবতী নারী ও পর্দানশীনদেরকেও ঈদে যেতে অনুমতি দিতেন।

চতুর্থ, ঈদের নামাযের জন্যে শহরের বাইরে যাওয়া মোস্তাহাব। কিন্তু মক্কা মোয়াযযমা ও বায়তুল মোকাদ্দাসে মসজিদে নামায পড়া

উচিত। বৃষ্টি বর্ষিত হলে মসজিদে ঈদের নামায পড়াতে দোষ নেই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না হলে ইমাম দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদেরকে মসজিদে নামায পড়িয়ে দেয়ার অনুমতি কোন ব্যক্তিকে দেবেন এবং নিজে সমর্থ লোকদেরকে নিয়ে বাইরে যাবেন। সকলেই তকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যাবে।

পঞ্চম, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ঈদের নামাযের সময় সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত। কোরবানী করার সময় ১০ তারিখে সূর্যোদয়ের এতটুকু পরে শুরু হয়, যতটুকু সময়ের মধ্যে দু'রাকআত নামায ও দু'খোতবা হয়ে যায়। এর পর এই সময় ১৩ তারিখের শেষ পর্যন্ত থাকে। ঈদুল আযহার নামায সকালে পড়া মোস্তাহাব। কেননা, নামাযের পরে কোরবানী করতে হয়। ঈদুল ফেতরের নামায দেরীতে পড়া মোস্তাহাব। কেননা, এ নামাযের আগে সদকায়ে ফেতর বন্টন করতে হয়। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকা।

ষষ্ঠ, ঈদের নামাযের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে মানুষ তকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যায়। ইমাম সেখানে পৌঁছে বসবে না এবং নফল পড়বে না। অন্যেরা নফল পড়তে পারে। এর পর একজন ঘোষক الصلوة جامعة (নামায শুরু হচ্ছে) বলে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করবে। অতঃপর ইমাম দু'রাকআত পড়বে। প্রথম রাকআতে তকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তকবীর ছাড়া তিন বার আল্লাহু আকবার বলবে। এর পর আলহামদুর পরে সূরা ক্বাফ পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে اقتربت الساعة পড়বে। দ্বিতীয় রাকআতে কেরাআত শেষে অতিরিক্ত তিন তকবীর বলবে। এর পর দুটি খোতবা পাঠ করবে এবং মাঝখানে বসবে।

সপ্তম, ভেড়া কোরবানী করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বহস্তে একটি ভেড়া যবেহ করেন এবং বলেন ঃ

بسم الله والله اكبر هذا عنى وعن من لم يضح من امتى -

–শুরু আল্লাহর নামে। আল্লাহ মহান। এটা আমার পক্ষ থেকে এবং

আমার উম্মতের সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে, যে কোরবানী করেনি।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যেব্যক্তি যিলহজ্জের চাঁদ দেখে এবং তার কোরবানী করার ইচ্ছা থাকে, সে যেন চুল ও নখ না কাটে। হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে একজন তার গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কোরবানী করত এবং তারা সকলেই খেত ও খাওয়াত। তিন দিন অথবা আরও বেশী দিন কোরবানীর গোশত খাওয়া জায়েয। প্রথমে এটা নিষিদ্ধ ছিল। পরে অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ ঈদুল ফেতরের পর বার রাকআত ও ঈদুল আযহার পর ছয় রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। এটা মসনূন আমল।

তারাবীহ– তারাবীহ কুড়ি রাকআত। এটা সুন্নতে মোআক্কাদা। তবে দুই ঈদের নামাযের তুলনায় এর উপর জোর কম। তারাবীহ জামাআতে পড়া উত্তম, না একা পড়া– এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ নামায দুই অথবা তিন রাতে জামাআত সহকারে পড়েছিলেন। এর পর জামাআতে পড়েননি এবং বলেন ঃ আমার আশংকা হয়, এটা তোমাদের উপর ওয়াজিব না হয়ে যায়। হযরত ওমর (রাঃ) মুসলমানদেরকে তারাবীহের জামাআতে একত্রিত করে দেন। কেননা, ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তা ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল না। সুতরাং কতক আলেম হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ কাজের কারণে বলেন, তারাবীহ জামাআতে পড়া উত্তম। এ ছাড়া সকলের সমবেত হওয়ার মধ্যে বরকত আছে। একাকিত্বে মাঝে মাঝে আলস্যও স্পর্শ করে। সমাবেশ দেখলে মন প্রফুল্ল হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ তারাবীহ একা পড়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ আমার এ মসজিদে এক নামায অন্য মসজিদে একশ' নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এসব নামাযের চেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তির নামায, যে তার গৃহের কোণে দু'রাকআত পড়ে এবং তার খবর আল্লাহ ব্যতীত কেউ রাখে না। এর কারণ, রিয়া ও বানোয়াট অধিকতর সমাবেশের মধ্যেই হয়ে থাকে। একান্তে মানুষ এগুলো থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু পছন্দনীয় উক্তি ইচ্ছে, তারাবীহ জামাআতে পড়াই ভাল। কেননা, কতক নফল নামায জামাআত সিদ্ধ। তারাবীহর প্রকাশও কর্তব্য।

রজবের নামায– রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে রোযা রাখে, অতঃপর মাগরিব ও এশার মাঝখানে দু' দু'রাকআত করে বারো রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা কদর তিন বার, সূরা এখলাস বারো বার এবং নামাযান্তে পঁচাত্তর বার এই দরূদ পড়ে– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِه এর পর সেজদায় সত্তর বার বলে– سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ অতঃপর মাথা তুলে সত্তর বার বলে رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيُّ الْاَعْظَمُ –এর পর দ্বিতীয় সেজদা করে এবং প্রথম সেজদায় যা বলেছিল তাই বলে, এর পর সেজদার মধ্যেই নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করে, তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করা হবে। তার সব গোনাহ্ মার্জনা করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা, বালুকার সংখ্যা, পাহাড়ের ওজন এবং বৃক্ষের পত্রসম হয়। কেয়ামতের দিন সে তার পরিবারের সাতশ' মানুষের শাফায়াত করবে, যারা দোযখের যোগ্য হবে।

শাবানের নামায– শাবানের ১৫ তারিখ রাতে দু'দু'রাকআত করে একশ' রাকআত পড়বে। প্রতি রাকআতে আলহামদুর পরে এগার বার সূরা এখলাস পড়বে। এক'শ' রাকআত সম্ভবপর না হলে দশ রাকআত এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদুর পরে একশ' বার সূরা এখলাস পড়বে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ নামায পড়তেন এবং একে 'সালাতে খায়র' বলতেন। মাঝে মাঝে তারা এ নামায জামাআতেও পড়তেন। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ ত্রিশ জন সাহাবী আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, যেব্যক্তি রাতে এ নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার দিকে সত্তর বার রহমতের দৃষ্টি দেবেন এবং প্রত্যেক বারের দৃষ্টিতে তার সত্তরটি প্রয়োজন মেটাবেন। তার মধ্যে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হচ্ছে মাগফেরাত।

আর এক প্রকার নফল নামায রয়েছে যা ফরযের সাথে সম্পৃক্ত এবং কোন বিশেষ সময়ের সাথে জড়িত নয়। যেমন সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায, বৃষ্টির নামায, তাহিয়্যাতুল মসজিদ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে এখানে কয়েকটি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

গ্রহণের নামায

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لايخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذالك فافزعوا الى ذكر الله والصلوة ـ

"নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তাআলার দু'টি নিদর্শন। কারও মৃত্যু ও জন্মের কারণে এগুলোর গ্রহণ হয় না। যখন এই গ্রহণ দেখ, তখন দ্রুত যিকির ও নামাযের দিকে ধাবিত হও।" তিনি একথা তখন বলেছিলেন, যখন তাঁর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যু হয়েছিল এবং সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। এতে লোকেরা বলাবলি করছিল, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। এ নামায পড়ার নিয়ম এই– যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন মাকরূহ সময়ে হলেও মানুষকে নামাযের জন্যে الصلوة جامعة বলে আহ্বান করবে। এর পর ইমাম তাদেরকে নিয়ে মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে দু'টি রুকু করবে। প্রথম রুকু বড় হবে এবং দ্বিতীয় রুকু ছোট। কেরাআত সরবে পড়বে না। প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা বাকারা পাঠ করবে। প্রথম রুকুর পরে দ্বিতীয় কেয়ামে আলহামুদ ও আলে এমরান পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকআতে কেয়ামে আলহামদু ও সূরা নেসা এবং প্রথম রুকুর পর দ্বিতীয় কেয়ামে আলহামদু ও সূরা মায়েদা পড়বে, আথবা কোরআনের যেখান থেকে ইচ্ছা পড়বে। যদি প্রত্যেক কেয়ামে কেবল আলহামদুই পাঠ করে তবুও যথেষ্ট হবে। ছোট ছোট সূরা পড়লেও কোন দোষ নেই। নামায দীর্ঘ করার উদ্দেশ্য গ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়া। প্রথম রুকুতে একশ' আয়াত পরিমাণে, দ্বিতীয় রুকুতে আশি আয়াত পরিমাণে, তৃতীয় রুকুতে সত্তর আয়াত পরিমাণে এবং চতুর্থ রুকুতে পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণে তসবীহ্ পাঠ করবে। সেজদা ও রুকুর অনুরূপ হওয়া উচিত। এর পর নামায শেষে দু'টি খোতবা পাঠ করবে। মাঝখানে বসবে। উভয় খোতবার মানুষকে সদকা দেয়ার ও তওবা করার

আদেশ দেবে। চন্দ্রগ্রহণেও তাই করবে। কিন্তু তাতে কোরআন সরবে পাঠ করবে না। কেননা, এ নামায রাতের বেলায় হবে। যতক্ষণ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ এই নামায পড়ার সময়। নামাযের মধ্যেই গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে নামায সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্ণ করে নেবে।

বৃষ্টির নামায– যখন নদীর পানি শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তখন মানুষকে তিন দিন রোযা রাখতে বলা ইমামের জন্য মোস্তাহাব। এ সময় ইমাম সাধ্যানুয়ায়ী খয়রাত করা, কারও পাওনা থাকলে তা আদায় করা এবং গোনাহ থেকে তওবা করারও উপদেশ দেবে। এর পর চতুর্থ দিন আবাল বৃদ্ধবনিতাসহ গোসল করে বের হবে। অনুনয় বিনয় প্রকাশ পায় এমন ছেঁড়া বস্ত্র পরিধান করবে এবং বিনয়ের ভঙ্গিমায় গমন করবে। কেউ কেউ বলেন ঃ চতুষ্পদ জীব-জন্তুসমূহ সাথে নিয়ে যাওয়া মোস্তাহাব। হাদীসে বলা হয়েছে–

لو لاصبيان رضيع ومشائخ راكع وبهائم راتع اصب عليكم العذاب صبا ـ

অর্থাৎ, "যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু, এবাদতে লিপ্ত মাশায়েখ ও চারণকারী চতুষ্পদ জন্তু না থাকত, তবে তোমাদের উপর আযাব নাযিল করা হত।"

বিস্তীর্ণ মাঠে একত্রিত হওয়ার পর ইমাম তাদেরকে ঈদের নামাযের ন্যায় দু'রাকআত নামায পড়াবেন; কিন্তু তাতে অতিরিক্ত তকবীর থাকবে না। এর পর দুটি খোতবা পাঠ করবেন। উভয় খোতবার অধিকাংশ বিষয়বস্তু এস্তেগফার অর্থাৎ কৃত গোনাহখাতা থেকে ক্ষমা চাওয়া উচিত। দ্বিতীয় খোতবার মাঝখানে ইমাম মুসল্লীদের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে কেবলামুখী হয়ে যাবে এবং নিজের চাদর এমনভাবে ওলটপালট করবে, যেন নীচের অংশ উপরে এবং ডানের অংশ বামে চলে যায়। মুসল্লীরাও তাদের চাদরের দিক এমনিভাবে পাল্টে নেবে। তখন আস্তে আস্তে দোয়া করবে। চাদর পাল্টানোর মধ্যে এই শুভ ইঙ্গিত রয়েছে, দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির স্থিতি এমনিভাবে পাল্টে যাক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করেছেন। এর পর ইমাম মুসল্লীদের দিকে মুখ করে খোতবা শেষ করবে এবং চাদর

পাল্টানো অবস্থায়ই থাকতে দেবে। দোয়া এভাবে করবে; ইলাহী, আপনি আমাদেরকে দোয়া করার আদেশ এবং তা কবুল করার ওয়াদা দিয়েছেন। অতএব আমরা আপনার আদেশ অনুযায়ী দোয়া করছি। এখন আপনার ওয়াদা অনুযায়ী তা কবুল করুন। ইলাহী, আমরা যেসব গোনাহ্ করেছি, সেগুলো মার্জনা করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমাদের রিযিক বৃদ্ধি ও বৃষ্টির জন্যে আমাদের দোয়া কবুল করুন।

জানাযার নামায– এ নামাযের নিয়ম সুবিদিত। এক সহীহ্ রেওয়ায়েতে আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত দোয়াটি এ নামাযে অধিক ব্যাপক। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এক জানাযার নামায পড়তে দেখেছি এবং তাতে তিনি যে দোয়া করেন তা দোয়া মুখস্থ করে নিয়েছি। তিনি বলছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, তাঁর মাগফেরাত করুন, তাঁর প্রতি রহম করুন, তাঁর প্রবেশ পথ (কবর) বিস্তৃত করুন, তাঁকে বরফ ও শিলার পানি দিয়ে গোসল দিন, তাঁকে গোনাহ থেকে পবিত্র করুন, যেমন আপনি সাদা বস্ত্রকে ময়লা থেকে পবিত্র করেছেন, তাঁকে তাঁর গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দিন, তাঁর পরিবারের বদলে উত্তম পরিবার দিন, তাঁর স্ত্রীর বদলে উত্তম স্ত্রী দিন, তাঁকে জান্নাতে দাখিল করুন এবং কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় দিন।"

হযরত আওফ বলেন ঃ এ দোয়া শুনে আমার বাসনা হল, হায়, এ মৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ দোয়া যদি আমার

জন্যে হত! যেব্যক্তি দ্বিতীয় তকবীরে শরীক হয়, সে ইমামের সাথে অবশিষ্ট তকবীরগুলো বলবে এবং সালামের পর ছুটে যাওয়া তকবীরটি আদায় করে নেবে, যেমন মসবুক ব্যক্তি সালামের পর ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করে। তকবীরসমূহই জানাযার নামাযের বাহ্যিক আরকান। সেমতে অন্যান্য নামাযের রাকআতসমূহের স্থলাভিষিক্ত এ নামাযের তকবীরগুলো হওয়া উচিত। এটা আমার মতে অধিক যুক্তিসঙ্গত, যদিও আরও সম্ভাবনা আছে। জানাযার নামাযের সওয়াব এবং এর সাথে গমনের ফযীলত সম্পর্কে অনেক মশহুর হাদীস বর্ণিত আছে। সেগুলো উল্লেখ করে আমরা বিষয়বস্তু দীর্ঘ করতে চাই না। এর সওয়াব অনেক বেশী । কেননা, এটা ফরযে কেফায়া। নফল তার জন্যেই, যার উপর অন্য ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে নির্দিষ্ট হয়ে যায় না । নির্দিষ্ট না হলেও সে ফরযে কেফায়ারই সওয়াব পায়। জানাযার নামাযে অধিক লোকের উপস্থিতি মোস্তাহাব । বেশী লোক হলে দোয়া বেশী হবে এবং তাদের মধ্যে কেউ হয়তো এমনও থাকবে, যার দোয়া কবুল হয়। কুরায়ব বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এক ছেলের ইন্তেকাল হয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন ঃ তার জানাযায় কত লোক উপস্থিত হয়েছে দেখ । আমি দেখার পর বললাম ঃ অনেক লোক হয়েছে। তিনি বললেন ঃ চল্লিশ জন হয়েছে ? আমি বললাম ঃ হাঁ । তিনি বললেন ঃ এখন জানাযা বের কর । আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– যদি কোন মুসলমান মারা যায় এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশ ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সুপারিশ মৃত ব্যক্তির জন্য কবুল করেন। লোকজন যখন জানাযার সাথে কবরস্থানে পৌঁছে অথবা এমনিতেও কবরস্থানে যায়, তখন এই দোয়া করবে–

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ـ

অর্থাৎ, গৃহবাসী মুমিন ও মুসলমানদের প্রতি সালাম । আমাদের

অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। আমরাও ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত হব। দাফন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে প্রস্থান না করা উত্তম । দাফন সম্পন্ন হয়ে গেলে কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বলবে– ইলাহী, আপনার বান্দা আপনার কাছে সমর্পিত হয়েছে। আপনি তার প্রতি রহম করুন। ইলাহী, তার উভয় পার্শ্ব থেকে মাটি সরিয়ে দিন। তার আত্মার জন্যে আকাশের দরজা খুলে দিন, তার আমল কবুল করুন। ইলাহী, সে সৎ হলে সওয়াব দ্বিগুণ করুন এবং গোনাহগার হলে তার গোনাহ্ ক্ষমা করুন।

তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায– এ দু'রাকআত নামায সুন্নত। জুমআর দিনে ইমাম খোতবা পাঠ করলেও এ নামায পড়া উচিত। যদি কেউ মসজিদে গিয়ে ফরয অথবা কাযা নামাযে ব্যাপৃত হয়, তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় এবং সওয়াব অর্জিত হয়ে যায়। কেননা, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মসজিদে যাওয়ার প্রারম্ভ এমন এবাদত থেকে শূন্য না হওয়া, যা মসজিদের জন্যে নির্দিষ্ট, যাতে মসজিদের হক আদায় হয়। এজন্যই ওযুবিহীন অবস্থায় মসজিদে যাওয়া মাকরূহ। যদি মসজিদ হয়ে অন্য দিকে যাওয়ার জন্যে অথবা মসজিদে বসার জন্যে প্রবেশ করে, তবে চার বার সোবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলে নেবে। কথিত আছে, এর সওয়াব দু'রাকআত নামাযের সমান। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে মাকরূহ সমস্তগুলোতে অর্থাৎ, আসর ও ফজর নামাযের পর সূর্য ঢলে পড়ার সময় এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাকআত পড়া মাকরূহ নয়। কেননা, বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের পর দু'রাকআত পড়লে কেউ আরজ করল ঃ আপনি তো আমাদেরকে এ নামায পড়তে নিষেধ করেছেন ? তিনি বললেন ঃ এ দু'রাকআত নামায আমি যোহরের পরে পড়তাম, কিন্তু বাইরের লোক নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে আজ পড়তে পারিনি। এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় জানা গেল– (১) এমন নামায পড়া এ সময়ে মাকরূহ, যার কোন কারণ নেই। নফল নামাযের কাযা একটি দুর্বল কারণ। কেননা, আলেমগণ এ সম্পর্কে একমত নন, নফলের কাযা পড়া উচিত কিনা এবং যে নফল কাযা হয়ে যায়, তার মত নামায পড়ে দিলে নফলের কাযা হয়ে যাবে কিনা। সুতরাং এই দুর্বল কারণের জন্যে যখন আসরের পর নফল মাকরূহ রইল না, তখন মসজিদে আসা, যা একটি পূর্ণাঙ্গ কারণ, তার জন্য আরও উত্তমরূপে মাকরূহ থাকবে না। এ কারণেই জানাযা এসে গেলে জানাযার নামায, গ্রহণের নামায ও বৃষ্টির নামায কোন সময়ই মাকরূহ নয়। কেননা, এসব নামাযের কারণ আছে। মাকরূহ সেই নামায হয়, যার কারণ নেই। (২) আরও জানা গেল, নফলের কাযা পড়া দুরস্ত। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নফলের কাযা পড়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিদ্রার আধিক্য অথবা রোগের কারণে রাত্রি বেলায় উঠতে না পারলে দিনের বেলায় বার রাকআত পড়ে নিতেন। জনৈক আলেম বলেন ঃ যেব্যক্তি নামাযে থাকার কারণে মুয়াযযিনের আযানের জওয়াব দিতে পারে না, তার উচিত সালামের পর তা কাযা করে নেয়া, যদিও তখন মুয়াযযিন চুপ হয়ে যায়। যদি কারও কোন নির্দিষ্ট ওযিফা থাকে এবং ওযরবশতঃ তা আদায় করতে না পারে, তবে অন্য সময়ে তা আদায় করে নেবে, যাতে তার নফ্স আরামপ্রবণ না হয়ে উঠে। সুতরাং এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া একে তো নফসের মোজাহাদার জন্যে ভাল, দ্বিতীয়তঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل -

আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক পছন্দনীয় আমল তাই, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা কম।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে আল্লাহর এবাদত করে, এরপর ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন।

ওযুর নামায– ওযু করার পর দু'রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। কারণ, ওযু একটি সওয়াবের কাজ। এর উদ্দেশ্য নামায পড়া। বে-ওযু হওয়ার আশংকা সব সময় লেগে থাকে। তাই নামাযের পূর্বেই ওযু ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার এবং প্রথম ওযুর শ্রম নিষ্ফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেমতে ওযু করার সাথে সাথে দু'রাকআত পড়ে নেয়া মোস্তাহাব, যাতে উদ্দেশ্য ফওত না হয়ে যায়। হযরত বেলাল (রাঃ)-এর হাদীস থেকে এটা জানা গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে বেলালকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি আমার আগে এখানে পৌছে গেলে

কিরূপে। বেলাল বললেন ঃ আমি কিছু জানি না। কেবল এতটুকু জানি, যখন আমি নতুন ওযু করি তখনই দু'রাকআত নামায পড়ে নেই।

গৃহে গমন ও নির্গমনের নামায– হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তুমি যখন গৃহ থেকে বের হও, তখন দু'রাকআত নামায পড়ে নাও। এটা তোমার অশুভ নির্গমনের জন্যে বাধা হবে। আর যখন তুমি গৃহে গমন কর, তখন দু'রাকআত নামায পড়ে নাও। এটা তোমাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবে। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থ, গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়া উচিত। এ কারণে এহরাম বাঁধার সময় দু'রাকআত, সফরের শুরুতে দু'রাকআত এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর গৃহে যাওয়ার পূর্বে মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়ার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। এগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্ম থেকে বর্ণিত। জনৈক সালেহ ব্যক্তি যখন কোন খাদ্য খেতেন অথবা পানি পান করতেন, তখন, দু'রাকআত নামায পড়ে নিতেন।

মানুষের কাজকর্ম তিন প্রকার– (১) কতক কাজ বার বার হয়ে থাকে, যেমন পানাহার। এ ধরনের কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

كل امر ذى بال لم يبدا بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر ـ

অর্থাৎ, যেকোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শুরু না করলে অসম্পূর্ণ থাকে।

(২) কতক কাজ বার বার হয় না; কিন্তু তাতে গুরুত্ব থাকে। যেমন– বিবাহ, উপদেশ, পরামর্শ ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা সহকারে শুরু করা মোস্তাহাব। উদাহরণতঃ যে বিবাহ দেয় সে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রাসূলিল্লাহ– আমি আমার কন্যা তোমার বিবাহে দিলাম এবং যে বিবাহ করে সে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রাসূলিল্লাহ– আমি বিবাহ কবুল করলাম। সাহাবায়ে কেরাম উপদেশ দান ও পরামর্শ করার কাজে প্রথমে আল্লাহর হামদ করতেন।

(৩) কতক কাজ বার বার হয় না; কিন্তু হওয়ার পর বেশী দিন স্থায়ী থাকে এবং তাতে গুরুত্ব পাওয়া যায়। যেমন সফর করা, নতুন গৃহ ক্রয় করা, এহরাম বাঁধা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ করার পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। গৃহে আগমন ও গৃহ থেকে নির্গমন এগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন কাজ। এটাও যেন এক ছোট্ট সফর।

এস্তেখারার নামায– যেব্যক্তি কোন কাজ করার ইচ্ছা করে; কিন্তু কাজটি করা ভাল হবে কি না করা ভাল হবে, তা কিছুই জানে না, তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'রাকআত নামায পড়তে বলেছেন। সে প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস পাঠ করবে। নামাযান্তে এই দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَقَدِّرْهُ لِىْ ثُمَّ يَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَقَدِّرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

হে আল্লাহ, আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করি, আপনার শক্তির মাধ্যমে আপনার কাছে শক্তি এবং আপনার মহান কৃপা প্রার্থনা করি। কেননা, আপনি শক্তিমান, আমার কোন শক্তি নেই। আপনি জানেন, আমি জানি না। আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। হে আল্লাহ, যদি আপনার জ্ঞানে এ কাজটি আমার ইহকাল, পরকাল, পরিণাম, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে কল্যাণকর হয়, তবে এটি আমার জন্য অবধারিত করুন, অতঃপর একে আমার জন্যে সহজ করুন এবং এতে বরকত দিন। আর যদি আপনি জানেন, এ কাজটি

আমার ইহকাল, পরকাল, পরিণাম, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে ক্ষতিকর, তবে এ কাজ আমা থেকে এবং আমাকে এ কাজ থেকে দূরে রাখুন, আমার জন্যে কল্যাণ অবধারিত করুন, তা যেখানেই থাকুক না কেন। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এস্তেখারার দোয়া কোরআনের আয়াতের ন্যায় গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা দিতেন । এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন দু'রাকআত নামায পড়বে এবং সে কাজের নাম উল্লেখপূর্বক উপরোক্ত দোয়া করবে। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যেব্যক্তি চারটি বিষয় প্রাপ্ত হয়, সে চারটি বিষয় থেকে বঞ্চিত হয় না। যে শোকর প্রাপ্ত হয় সে অতিরিক্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয় না; যে তওবা প্রাপ্ত হয় সে কবুল থেকে বঞ্চিত হয় না; যে এস্তেখারা লাভ করে সে মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় না এবং যে পরামর্শ প্রাপ্ত হয়, সে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত হয় না।

হাজতের নামায– যেব্যক্তি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়, ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্যে তার উচিত হাজতের নামায পড়া । ওহায়ব ইবনুল ওরদ (রহঃ) বলেন ঃ যেসব দোয়া অগ্রাহ্য হয় না, সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, বান্দা বার রাকআত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, আয়াতুল কুরসী ও কুল হুওয়াল্লাহু পড়বে। এর পর সেজদা করতঃ এই দোয়া পড়বে–

سُبْحَانَ الَّذِىْ تَقَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ
اَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَايَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ
اِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِى الْمَنِّ وَالْفَضْلِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزِّ وَالْكَرَمِ
سُبْحَانَ ذِى الطَّوْلِ اَسْئَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ
وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَجَدِّكَ
الْاَعْلٰى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ
اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ

অর্থাৎ, পবিত্র সেই সত্তা, যিনি মাহাত্ম্যকে আপন চাদর করেছেন এবং তদ্দ্বারা মহৎ হয়েছেন। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আপন জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করেছেন। পবিত্র সেই সত্তা, একমাত্র যাঁর জন্যে তসবীহ উপযুক্ত । পবিত্র, অনুগ্রহ ও কৃপাবিশিষ্ট সত্তা। পবিত্র ইযযত ও দানশীলতাবিশিষ্ট সত্তা । পবিত্র নেয়ামতবিশিষ্ট সত্তা । ইলাহী, আমি আপনার কাছে আপনার আরশের জন্যে উপযুক্ত ইযযতের মাধ্যমে এবং আপনার কিতাবের চূড়ান্ত রহমতের মাধ্যমে, আপনার উচ্চ শানের মাধ্যমে এবং আপনার পরিপূর্ণ কলেমাসমূহের মাধ্যমে, যা কোন সৎ ও অসৎ ব্যক্ত অতিক্রম করতে পারে না– এই প্রার্থনা করছি, মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত নাযিল করুন।

এর পর আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করবে, যদি তা কোন গোনাহের বিষয় না হয় । ইনশাআল্লাহ এ প্রার্থনা কবুল হবে। ওহায়ব বলেন ঃ প্রাচীন লোকগণ বলতেন, এ দোয়া বোকাদেরকে শিখিয়ো না। নতুবা তারা এর মাধ্যমে গোনাহের কাজে সাহায্য নেবে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এ রেওয়ায়েতটি রসূলে করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

সালাতুত্তাসবীহ্– এ নামাযটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে হুবহু বর্ণিত আছে। এটা কোন সময় ও কারণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ নামায একবার পড়া থেকে কোন সপ্তাহ অথবা মাস খালি না থাকা মোস্তাহাব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পিতৃব্য আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে বললেন ঃ আমি আপনাকে একটি বস্তু দিচ্ছি, একটি বিষয় শেখাচ্ছি। আপনি যখন এটা করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা আপনার ভূত-ভবিষ্যৎ, পরাতন ও নতুন, জানা ও অজানা এবং প্রকাশ্য ও গোপন সকল গোনাহ্ মাফ করে দেবেন। বিষয়টি এই, আপনি চার রাকআত নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও একটি সূরা পাঠ করবেন। যখন প্রথম রাকআতের কেরাআত শেষ হয়, তখন দণ্ডায়মান অবস্থায় সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পনর বার, এরপর রুকু করে রুকুতে দশ বার এই কলেমা পড়বেন, এর পর দাঁড়িয়ে এই কলেমা দশ বার, এর পর সেজদা করে সেজদায় দশ বার, মাথা তুলে বসা অবস্থায় দশ বার, এভাবে প্রতি রাকআতে মোট পঁচাত্তর বার এই কলেমা পাঠ করে চার রাকআত

নামায সম্পন্ন করবেন। সম্ভব হলে এ নামায প্রত্যেক দিন পড়ুন, নতুবা প্রত্যেক জুমআর দিনে একবার, এটাও সম্ভব না হলে মাসে একবার পড়ুন। এক রেওয়ায়েতে আছে, শুরুতে সানা পড়বেন, এর পর পনের বার উপরোক্ত তসবীহ্ কেরাআতের পূর্বে এবং দশ বার কেরাআতের পরে পাঠ করবেন; রাকআতের অবশিষ্টাংশে প্রথম রেওয়ায়েতের অনুরূপ পাঠ করবেন; কিন্তু দ্বিতীয় সেজদার পর কিছুই পাঠ করবেন না। এই রেওয়ায়েত উত্তম। উভয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী চার রাকআত এক সালামে এবং রাতের বেলায় চার রাকআত দু'সালামে পড়বে। কেননা, হাদীসে আছে– صلوة الليل مثنى مثنى (রাতের নফল নামায দু'রাকআত করে)। উপরোক্ত কলেমার পরে وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ কলেমা যোগ করা উত্তম। কতক রেওয়ায়েতে এ কলেমাও বর্ণিত হয়েছে।

উপরে বর্ণিত নফল নামাযসমূহের মধ্যে তাহিয়্যাতুল মসজিদ, গ্রহণের নামায ও বৃষ্টির নামায ছাড়া অন্য কোন নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব নয়। ওযুর দু'রাকআত, সফরের দু'রাকআত, গৃহ থেকে বের হওয়ার নামায এবং এস্তেখারার নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া যাবে না। কেননা, এসবের কারণ দুর্বল এবং মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা জোরদার। অতএব এসব নামায প্রথমোক্ত তিন প্রকার নামাযের মর্তবায় পৌঁছে না। আমি কতক সূফীকে মাকরূহ ওয়াক্তে ওযুর দু'রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। অথচ এটা নীতিবিরুদ্ধ। কেননা, ওযু নামাযের কারণ নয়; বরং নামায ওযুর কারণ হয়। কাজেই নামায পড়ার জন্যে ওযু করা উচিত। এটা নয় যে, নামায পড়বে ওযু করার জন্যে। যেব্যক্তি মাকরূহ ওয়াক্তে তার ওযু নামায থেকে খালি রাখতে চায় না, তার উচিত ওযুর পরে দু'রাকআত কাযার নিয়ত করা। কেননা, তার যিম্মায় কোন কাযা নামায থাকা সম্ভবপর। কাযা নামায মাকরূহ ওয়াক্তেও মাকরূহ নয়। কিন্তু মাকরূহ ওয়াক্তে নফলের নিয়ত করার কোন কারণ নেই। এসব ওয়াক্তে নফল নামায পড়তে নিষেধ করার পেছনে তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য। প্রথম, সূর্যপূজারীদের সাথে সামঞ্জস্য থেকে আত্মরক্ষা করা। দ্বিতীয়, শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করা। হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ

(সাঃ) বলেন ঃ সূর্যোদয় হয় আর তার সাথে শয়তানের মস্তকের একটি প্রান্ত সংযুক্ত থাকে। সূর্য উপরে উঠে গেলে তা পৃথক হয়ে যায়। যখন ঠিক দ্বিপ্রহর হয় তখন আবার মিলিত হয়ে যায়। যখন ঢলে পড়ে তখন চলে যায়। এর পর যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে, তখন শয়তানের মাথা আবার সংযুক্ত হয় এবং অস্ত যাওয়ার পর আলাদা হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ তিন সময়ে পড়তে নিষেধ করে তার কারণ বলে দিয়েছেন। তৃতীয়, আধ্যাত্ম পথের পথিক সর্বদা নিয়মিত নামায পড়ে। এবাদত একই প্রকারে নিয়মিত করা পরিণামে বিষণ্ণতা সৃষ্টি করে। যদি এক ঘন্টা এবাদত বন্ধ রাখা হয় তবে প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায় এবং ইচ্ছা নতুনতর হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

যাকাতের বর্ণনা

জানা উচিত, আল্লাহ তাআলা যাকাতকে ইসলামের একটি স্তম্ভ করেছেন এবং নামাযের পর এর কথাই উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ـ

অর্থাৎ, তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلوة وايتاء الزكوة ـ

অর্থাৎ, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত -- এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল, নামায কয়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা।

যারা যাকাত প্রদান করে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারণ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

এ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ যাকাত প্রদান করা। আহনাফ ইবনে কয়স (রাঃ) বলেন ঃ আমি কযেকজন কোরায়েশের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় হযরত আবু যর (রাঃ) সেখান দিয়ে গমন করলেন। তিনি বললেন ঃ কাফেরদেরকে শুনিয়ে দাও একটি দাগের খবর, যা তাদের পিঠে লাগবে এবং পাঁজরের হাড্ডি হয়ে বের হবে। আরেকটি দাগ তাদের গ্রীবায় লাগবে এবং কপাল পার হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এমন সময়ে পৌঁছলাম, যখন

তিনি কাবা গৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন ঃ কাবার পালনকর্তার কসম, তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত । আমি আরজ করলাম ঃ হুযুর, কাদের কথা বলছেন? তিনি বললেন ঃ যাদের কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে। কিন্তু যারা ডানে, বামে, সম্মুখে ও পেছনে ধন-সম্পদ ছড়ায় এবং খয়রাত করে (তাদের কথা আলাদা), এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম । তিনি আরও বললেন ঃ যে উটওয়ালা, ছাগলওয়ালা ও গরুওয়ালা তাদের যাকাত প্রদান করে না, কেয়ামতের দিন এসব জন্তু খুব বড় ও মোটাতাজা হয়ে আসবে এবং এ ব্যক্তিকে শিং দ্বারা গুঁতো মারবে আর খুর দ্বারা পিষ্ট করবে। যখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল জন্তু তাকে মারা শেষ করবে, তখন পুনরায় এমনিভাবে শুরু করবে। মানুষের মধ্যে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব অব্যাহত থাকবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যাকাতের প্রকার ও ওয়াজেব হওয়ার কারণ

ধন-সম্পদের দিক দিয়ে যাকাত ছয় প্রকার । নিম্নে প্রত্যেক প্রকার আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম প্রকার-- গৃহপালিত জন্তুর যাকাত প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন ব্যক্তির উপর ওয়াজেব । তার বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়া শর্ত । এখন যে চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত ওয়াজেব হয় তার জন্যে শর্ত পাঁচটি ; প্রথমতঃ বিশেষ চতুষ্পদ জন্তু হওয়া। কেননা, যাকাত কেবল উট, গরু ও ছাগলের মধ্যে ফরয। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার মধ্যে ফরয নয়। দ্বিতীয় ঃ জঙ্গলে ঘাস খাওয়া ; কেননা, যেসকল জন্তু গৃহেই ঘাস খায়, সেগুলোর উপর যাকাত নেই। তৃতীয়তঃ এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়া। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لازكوة الا فى مال حتى يحول عليه الحول ـ

অর্থাৎ, যে মালের উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয় না, তাতে যাকাত নেই।

এ বিধানে বাচ্চা জন্তু বড় জন্তুর অনুগামী হয়। অর্থাৎ, বড় জন্তুর উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয়ে-গেলে বাচ্চাদেরও যাকাত দিতে

হবে, যদিও সেগুলোর এক বছর পূর্ণ না হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যা বিক্রয় করে দেয়া হয় অথবা দান করা হয়, তা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। চতুর্থতঃ মালের উপর পূর্ণ মালিকানা শর্ত। ফলে হারানো মালের যাকাত দেয়া ওয়াজেব নয়, যে পর্যন্ত তা পুনরায় হস্তগত না হয়। হস্তগত হলে অতীত দিনেরও যাকাত ওয়াজেব হবে। যার কর্জ তার সম্পূর্ণ মালের অধিক, তার উপর যাকাত নেই। কেননা, এরূপ মালের কারণে সে ধনী নয়। এ মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তাকে ধনী বলা যেত । পঞ্চমতঃ নেসাব পূর্ণ হওয়া । এটা প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে আলাদা আলাদা । উদাহরণতঃ উটের সংখ্যা পাঁচ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত নেই। উট পাঁচটি হলে তাতে পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি ভেড়া অথবা পূর্ণ দু'বছর বয়সের একটি ছাগল যাকাতস্বরূপ দিতে হবে। দশটি উটে দু'টি, পনরটিতে তিনটি এবং বিশটিতে চারটি ছাগল দিতে হবে। উট পঁচিশটি হলে তাতে একটি বিনতে মাখায অর্থাৎ উটের মাদী বাচ্চা, যা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করে দিতে হবে। ছত্রিশটি উটে একটি বিনতে লাবুন, অর্থাৎ উটের মাদী বাচ্চা, যা তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে– দিতে হবে। ছেচল্লিশটি উটে একটি হিক্কা অর্থাৎ, চতুর্থ বছরের মাদী উট দিতে হবে। একষট্টিটি উটে জিযআ, অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়সের একটি উষ্ট্রী দিতে হবে। ছিয়াত্তরে দুটি বিনতে লাবুন, একানব্বইয়ে দু'হিক্কা এবং একশ' একুশ উটে তিনটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। এর পর উটের সংখ্যা একশ' ত্রিশ হয়ে গেলে প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে। এই হিসাবে একশ' ত্রিশটিতে একটি হিক্কা ও দুটি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে। গাভী ও বলদে ত্রিশটি হওয়া পর্যন্ত যাকাত নেই। ত্রিশটি হয়ে গেলে একটি তবী (দ্বিতীয় বছরে উপনীত নর বাছুর) যাকাত দিতে হবে । চল্লিশটি হলে একটি মুসিন্না অর্থাৎ, যে মাদী বাছুর তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে– দিতে হবে। ষাটটি হলে দুটি তবী দিতে হবে। এর পর প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি মুসিন্না ও প্রত্যেক ত্রিশটিতে একটি তবী যাকাত দিতে হবে। চল্লিশটি না হওয়া পর্যন্ত ছাগল ভেড়ার মধ্যে যাকাত নেই। চল্লিশটি হলে তাতে একটি ভেড়ার 'জিযআ' (পূর্ণ এক বছরের ভেড়া) অথবা ছাগলের 'ছানিয়া' (পূর্ণ দু'বছরের ছাগল) দিতে হবে। এরপর একশ' বিশ পর্যন্ত এ হার অব্যাহত থাকবে। একশ' একুশটি হলে দুশ' পর্যন্ত দু'টি ছাগল দিতে হবে। দুশ' এক হয়ে গেলে তিনশ' নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটি ছাগল এবং চারশ' হয়ে গেলে চারটি ছাগল দিতে হবে। অতঃপর প্রতি শ'তে একটি করে ছাগল দিতে হবে। নেসাবের মধ্যে দু'শরীকের যাকাত এক মালিকের মতই হবে। উদাহরণতঃ দু'ব্যক্তির শরীকানায় চল্লিশটি ছাগল থাকলে তাদের উপর এক ছাগলই ওয়াজেব হবে এবং তিন ব্যক্তির শরীকানায় একশ' বিশটি ছাগল থাকলে সকলের উপর এক ছাগলই ওয়াজেব হবে । অথচ আলাদা করলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে চল্লিশটি করে ছাগল পড়ে এবং তাতে একটি করে ছাগল ওয়াজেব হতে পারে। পালের মধ্যে সুস্থ জন্তু থাকলে অসুস্থ জন্তু যাকাতস্বরূপ গ্রহণ করা জায়েয নয়। ভাল জন্তুর মধ্যে ভাল এবং মন্দ জন্তুর মধ্যে মন্দ জন্তুই নিতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ খাদ্য জতীয় ফসলের যাকাত। এরূপ ফসল আটশ' সের অর্থাৎ বিশ মণ হলে তাতে দশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। ফলমূল ও তুলার মধ্যে যাকাত নেই। খোরমা ও কিশমিশ শুষ্ক অবস্থায় বিশ মণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজেব।

তৃতীয় প্রকার ঃ রৌপ্য ও স্বর্ণের যাকাত। খাঁটি রৌপ্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হল, তার যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। রৌপ্য আরও বেশী হলে এ হিসাবেই যাকাত ওয়াজেব হবে, যদিও এক দেরহাম বেশী হয়। স্বর্ণের নেসাব সাড়ে সাত তোলা। এতেও বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজেব। এক রতি বেশী হলেও এ হিসাবেই যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে নেসাব থেকে এক রতি কম হলেও যাকাত ওয়াজেব হবে না।

চতুর্থ প্রকার ঃ পণ্য দ্রব্যের যাকাত। এতে সোনা রূপার মত চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয়। এর বছর গণনা সেদিন থেকে হবে, যেদিন পণ্যদ্রব্য কেনার নেসাব পরিমাণ নগদ অর্থ ব্যবসায়ীর মালিকানায় আসে। যদি সেই নগদ অর্থ নেসাবের কম হয় অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যবসা করার নিয়তে মাল ক্রয় করে, তবে বছরের শুরু ক্রয় করার সময় থেকে হবে। বছরের শেষে পণ্যদ্রব্যের যে মুনাফা অর্জিত হয়, মূলধনের উপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে মুনাফার উপর যাকাত ওয়াজেব হয়ে যায়। মুনাফার উপর নতুনভাবে বছর অতিবাহিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

পঞ্চম প্রকার ঃ মাটির নীচে পুঁতে রাখা মাল ও খনিজ সামগ্রীর যাকাত। পুঁতে রাখা মাল মানে সেই মাল, যা কুফরের আমলে পুঁতে রাখা হয় এবং এমন জমিনে পাওয়া যায়, ইসলামী আমলে যার উপর কারও মালিকানা হয়নি। যেব্যক্তি এই পুঁতে রাখা মাল পাবে, তার কাছ থেকে সোনা-রূপা হলে এক পঞ্চমাংশ নেয়া হবে। এতে বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই। নেসাবের শর্ত না হওয়াও উত্তম। কেননা, এক পঞ্চমাংশ ওয়াজেব হওয়ার কারণে যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে এর সামঞ্জস্য বেশী। নেসাবের শর্ত রাখা হলেও তা অবান্তর নয়। কেননা, এই এক পঞ্চমাংশ এবং যাকাতের মাসরাফ তথা ব্যয় খাত একই। এ কারণেই সহীহ্ মাযহাব অনুযায়ী খাঁটি সোনা রূপাকেই 'দফীনা' তথা পুঁতে রাখা মাল বলা হবে, অন্য কিছুকে নয়। খনিজ পদার্থের মধ্যে কেবল সোনা-রূপার উপরই যাকাত ওয়াজেব হয়- অন্য কোন দ্রব্যের উপর ওয়াজেব হয় না। সোনা-রূপা খনি থেকে বের করে নেয়ার পর বিশুদ্ধতম উক্তি মোতাবেক তাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজেব হবে। এ উক্তি অনুযায়ী নেসাব হওয়া শর্ত। বছর অতিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে দু'উক্তির মধ্যে এক উক্তি হচ্ছে, খনির সোনা-রূপার মধ্যে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজেব। কাজেই বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই।

সাবধানতা হচ্ছে অল্প হোক কি বেশী, সকল প্রকার খনি থেকে এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা এবং বিশেষভাবে সোনা-রূপার খনি নয়- প্রত্যেক খনি থেকে এক-পঞ্চমাংশ দেয়া- যাতে মতভেদের কোন সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে।

ষষ্ঠ প্রকার ঃ সদকায়ে ফেতর। এটা এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব, যার কাছে ঈদুল ফেতরের দিনে তার এবং তার পরিবারের খাদ্যের অতিরিক্ত এক ছা' খাদ্য মৌজুদ থাকে। তিন সের আধা ছটাকে এক ছা' হয়। সদকায়ে ফেতরের পরিমাণ মাথাপিছু এক ছা'। পরিবারে যে খাদ্য খাওয়া হয়, তা অথবা তা থেকে উত্তম খাদ্য দেবে। সুতরাং পরিবারে গম খাওয়া হলে যব দেয়া দুরস্ত নয়। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খাওয়া হলে যেটি উত্তম সেটি দেবে; যেকোন একটি দিলেও হবে। (১) পুরুষ গৃহকর্তার উপর তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং যাদের ভরণ-পোষণ করতে হয়, এমন আত্মীয়দের সদকা দেয়া ওয়াজেব। যেমন, বাপ-দাদা, মা-নানী ইত্যাদি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা যাদের ভরণ পোষণ কর, তাদের সদকায়ে ফেতর আদায় করে দাও। স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে ফেতরা

দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে। যদি কারও কাছে এতটুকু খাদ্যই অতিরিক্ত হয়, যা কতক লোকের পক্ষ থেকে দিতে পারে, তবে কতক লোকের পক্ষ থেকেই আদায় করবে। তবে যাদের ভরণ-পোষণের তাকিদ বেশী, প্রথমে তাদের ফেতরা দেবে।

মোট কথা, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির এসব বিধান জেনে নেয়া উচিত এবং কোন বিরল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আলেমগণের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে তার উপর আমল করা দরকার।

(১) হানাফী মাযহাবমতে সদকায়ে ফেতর এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব, যে প্রয়োজনীয় বাসস্থান, অন্ন বস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়। এ নেসাবের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। এ সদকা সে নিজের থেকে, নিজের সন্তানদের পক্ষ থেকে এবং খেদমতের গোলামদের পক্ষ থেকে আদায় করবে। স্ত্রী এবং বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে দিতে হবে না। সদকায়ে ফেতরের পরিমাণ গম ও গম জাতীয় খাদ্যের অর্ধ ছা' এবং যব ও খেজুরের এক ছা'। এ পরিমাণ গমের মূল্য দিলেও সদকায়ে ফেতর আদায় হবে।

যাকাতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী

বাহ্যিক শর্তাবলী ঃ উল্লেখ্য, যাকাতদাতা ব্যক্তি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। প্রথমতঃ মনে মনে ফরয যাকাত দেয়ার নিয়ত করা। অমুক অমুক মালের যাকাত দেই- এরূপ নির্দিষ্ট করা জরুরী নয়। ওলীর নিয়ত উন্মাদ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের নিয়তের স্থলবর্তী হবে। তদ্রূপ শাসনকর্তার নিয়ত মালের মালিকের নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হবে- যদি মালের মালিক যাকাত না দেয়। কিন্তু এটা দুনিয়ার বাহ্যিক বিধান। আখেরাতে সে দাবী থেকে মুক্ত হবে না যে পর্যন্ত নতুনভাবে যাকাত না দেয়। যাকাত দেয়ার জন্য কাউকে উকিল করা হলে এবং তখন নিয়ত করে নিলে অথবা উকিলকে নিয়তেরও উকিল করা হলে যথেষ্ট হবে। কেননা, নিয়তের জন্যে উকিল করাও নিয়ত। দ্বিতীয়তঃ বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তড়িঘড়ি যাকাত দেয়া উচিত। সদকায়ে ফেতর ঈদের দিন থেকে বিলম্বিত করা উচিত নয়। যেব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মালের যাকাত

দিতে বিলম্ব করে, সে গোনাহগার হবে। এর পর যদি তার মাল বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং যাকাতের প্রাপককে পাওয়ার সামর্থ্য থাকে, তবে যাকাত তার যিম্মায় থেকে যাবে। যদি যাকাতের প্রাপক না পাওয়ার কারণে বিলম্ব হয় এবং ইতিমধ্যে মাল বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে যাকাত যিম্মায় থাকবে না। বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও যাকাত দেয়া জায়েয যদি মাল নেসাব পরিমাণে হয়ে যায়। দু'বছরের যাকাত অগ্রিম দেয়াও জায়েয। অগ্রিম যাকাত দিলে যদি যাকাত গ্রহীতা মিসকীন বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা যায় অথবা দর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা অন্য কোন মাল প্রাপ্তির কারণে ধনী হয়ে যায়, অথবা মালের মালিকের মাল বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে যা কিছু সে অগ্রিম দিয়েছিল তা যাকাতরূপে গণ্য হবে না। দেয়ার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্ত যোগ করে না থাকলে এটা ফেরত লওয়াও সম্ভবপর নয়। কাজেই মালের মালিককে অবশ্যই পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রিম যাকাত দিতে হবে।

তৃতীয়তঃ যাকাতস্বরূপ যে মাল ওয়াজেব হয়, তার বিনিময়ে মূল্য দিতে পারবে না; বরং যে মাল ওয়াজেব হয় তাই দেবে। এমনকি, স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ দেবে না, যদিও মূল্য বাড়িয়েই দেয়া হয়। সম্ভবতঃ যারা ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্য বুঝে না, তারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তারা কেবল দেখে, ফকীরের অভাব দূর করাই উদ্দেশ্য। অথচ এটা প্রকৃত জ্ঞানের কথা নয়। কেননা, ফকীরের অভাব দূর করা যাকাতের উদ্দেশ্য ঠিকই; কিন্তু এটা পূর্ণ উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্যের একটি অংশ মাত্র। শরীয়তের ওয়াজেব বিষয়সমূহ তিন প্রকার। এক, নিছক এবাদত। এতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কোন দখল নেই। উদাহরণতঃ হজ্জে কংকর নিক্ষেপ করা। এতে কাজটি শুরু করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য, যাতে বান্দা তার দাসত্ব ও গোলামী এমন কাজ দ্বারা প্রকাশ করে, যার অর্থ বোধগম্য নয়। কেননা, যে কাজের অর্থ বোধগম্য, তা সম্পাদনে মানুষের মনও সাহায্য করে। ফলে তাতে খাঁটি দাসত্ব প্রকাশ পায় না। কারণ একমাত্র মাবুদের আদেশের কারণেই কর্ম সম্পাদন করাকে দাসত্ব বলা হয়। হজ্জের অধিকাংশ ক্রিয়াকর্ম এমনি ধরনের। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) স্বীয় এহরামে এরশাদ করেন ঃ

لبيك لحجة حقا تعبدا ورقا ـ

আমি উপস্থিত আছি দাসত্বস্বরূপ হজ্জের জন্যে। অর্থাৎ, এ এহরাম

কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে দাসত্ব প্রকাশ করা এবং যেভাবে আদেশ হয়েছে তা মেনে নেয়া এমন কোন যুক্তি ব্যতিরেকে, যা এ আদেশ পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজেব কর্ম এমন, যার পেছনে কোন যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য রয়েছে– নিছক এবাদত বা দাসত্ব প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়; যেমন কর্জ শোধ করা এবং ছিনিয়ে নেয়া বস্তু ফেরত দেয়া। এতে নিয়ত ও কর্মই ধর্তব্য নয়; বরং হকদারের কাছে তার হক আসল অথবা বিনিময়– যেকোন আকারে পৌঁছে গেলেই ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে। এ দু'প্রকার ওয়াজেব সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা, ফলে সকলেরই বোধগম্য। কিন্তু তৃতীয় প্রকার ওয়াজেব কর্মে বান্দার অভাব দূর করা এবং তার দাসত্ব পরীক্ষা করা উভয় বিষয় উদ্দেশ্য। এ প্রকার ওয়াজেব কর্মে উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজেব এবং যে বিষয় অধিক প্রকাশ্য, তার দিকে লক্ষ্য রেখে অপর বিষয়টি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, অপর বিষয়টি অর্থাৎ দাসত্ব পরীক্ষার দিকটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়। যাকাত এমনি ধরনের একটি ওয়াজেব কর্ম। ইমাম শাফেয়ী ব্যতীত অন্য কেউ এ নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল নয়। যাকাতে গরীবের অভাব দূর করা একটি প্রকাশ্যতম বিষয় বিধায় এটা সহজে বোধগম্য। বিস্তারিত বর্ণনা অনুযায়ী যাকাত প্রদান করে দাসত্ব প্রকাশ করাও শরীয়তের লক্ষ্য। এদিক দিয়েই যাকাত নামায ও হজ্জের সমকক্ষ হয়ে ইসলামের একটি স্তম্ভ সাব্যস্ত হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই, প্রত্যেক প্রকারের মাল পৃথক করা, তা থেকে যাকাতের পরিমাণ বের করা এবং তা বর্ণিত আট প্রকার খাতে বন্টন করা একটি কঠিন কাজ। এতে শৈথিল্য করলে গরীবের স্বার্থে কোন ত্রুটি দেখা দেয় না; কিন্তু দাসত্ব প্রকাশে অবশ্যই ত্রুটি থেকে যায়।

চতুর্থতঃ যাকাতের অর্থ অন্য শহরে স্থানান্তর করবে না। কেননা প্রত্যেক শহরের মিসকীন সেই শহরের যাকাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্থানান্তর করা হলে তাদের আশা ভঙ্গ হবে। স্থানান্তর করলে এক উক্তি অনুযায়ী যাকাত আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু মতভেদজনিত সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা ভাল। কাজেই প্রত্যেক শহরের যাকাতের মাল সেই শহরের গরীবদের মধ্যে বন্টন করবে।

পঞ্চমতঃ কোরআনের বর্ণিত আট প্রকার খাতের মধ্যে থেকে যে কয় প্রকার খাত শহরে বিদ্যমান আছে, যাকাতের মাল ততভাগে ভাগ করবে। কেননা, নির্ধারিত খাতে যাকাতের অর্থ পৌঁছানো যাকাতদাতার উপর

ওয়াজেব। إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ الخ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ তাই। অর্থাৎ, যাকাত এই লোকদের কাছে পৌছা উচিত। এ আয়াতটি এমন, যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তি ওসিয়ত করে, তার এক-তৃতীয়াংশ মাল ফকীর ও মিসকীনদের জন্যে। এ ওসিয়ত এটাই চায় যে, তার মালের মধ্যে উভয় প্রকার লোক অংশীদার থাকবে। আয়াতেও সকল প্রকারের অংশীদারিত্ব বুঝানো হয়েছে। এবাদত অধ্যায়ে বাহ্যিক বিষয়াদিতে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা উচিত এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির প্রতিও দৃষ্টি দেয়া বাঞ্ছনীয়। আট প্রকারের মধ্যে দু'প্রকার খাত তো অধিকাংশ শহরেই অনুপস্থিত। এক, অন্তর জয় করার জন্যে যাদেরকে যাকাত দেয়া হয় এবং দুই, যাকাতের কর্মচারীবৃন্দ। চার প্রকার খাত সকল শহরেই বিদ্যমান আছে- ফকীর-মিসকীন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও নিঃস্ব মুসাফির। দু'প্রকার খাত কতক শহরে পাওয়া যায় এবং কতক শহরে পাওয়া যায় না। তারা হল গাযী ও মুকাতাব।

সুতরাং যাকাতদাতার শহরে যদি পাঁচ প্রকার খাত বিদ্যমান থাকে, তবে যাকাতের অর্থ সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করবে এবং প্রত্যেক প্রকার খাতকে এক ভাগ দেবে। প্রত্যেক খাতের সমান সংখ্যক ব্যক্তিকে দেয়াই ওয়াজেব নয়; বরং এক প্রকারের দশ ব্যক্তিকে এবং অন্য প্রকারের বিশ ব্যক্তিকে দেয়ার অধিকার যাকাতদাতার রয়েছে। তবে প্রত্যেক প্রকারের সংখ্যা যেন তিন জনের কম না হয়। সুতরাং শহরে পাঁচ প্রকার খাত বিদ্যমান থাকলে যাকাত পনর-ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করবে। যাকাতের পরিমাণ কম হওয়ার কারণে এভাবে বন্টন করা কঠিন হলে অন্য যাকাতদাতাদের সাথে শরীক হয়ে যাবে এবং সকলের মাল একত্রিত করে পনর ব্যক্তিকে সমর্পণ করবে, যাতে তারা পরস্পরে ভাগাভাগি করে নেয়। কেননা, সকলকে দেয়া জরুরী।

যাকাতের আভ্যন্তরীণ শিষ্টাচার

জানা উচিত, যারা আখেরাতের কামনা করে, তাদের জন্যে যাকাত প্রদানে কয়েকটি আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। প্রথমতঃ যাকাত ওয়াজেব হওয়ার কারণ হৃদয়ঙ্গম করা এবং একথা অনুধাবন করা, যাকাত কোন দৈহিক এবাদত নয়; আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ। এতদসত্ত্বেও এটা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ সাব্যস্ত হল কেন ? যাকাত ওয়াজেব হওয়ার কারণ তিনটি—

(১) শাহাদতের উভয় কলেমা পাঠের মানে হল তওহীদকে অপরিহার্য করা এবং মাবুদের একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করা। এটা এমনভাবে পূর্ণ করতে হবে, যেন তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রিয় না থাকে। কেননা, মহব্বত অংশীদারিত্ব কবুল করে না এবং কেবল মুখে তওহীদ উচ্চারণ করা তেমন উপকারী নয়। বরং মহব্বত আছে কিনা, প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ দ্বারা তা পরীক্ষা করা যায়। মানুষের কাছে মাল ও অর্থকড়ি অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। কেননা, এটাই সাংসারিক কার্যোদ্ধারের মোক্ষম হাতিয়ার। দুনিয়াতে মানুষ অর্থ-সম্পদকেই আপন মনে করে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে। অথচ মৃত্যুর মধ্যে আরাধ্য পরম প্রিয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। তাই মানুষের দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্যে কাম্য ও প্রিয় অর্থ সম্পদ আল্লাহর পথে বিসর্জন দিতে বলা হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

আল্লাহ্ মুমিনদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, এটা জেহাদ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভের আগ্রহে প্রাণ বিসর্জন দেয়া এবং অর্থকড়ি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া সাথে সম্পর্ক রাখে। অর্থ ব্যয় করার এই রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করলে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম শ্রেণী তারা, যারা তওহীদকে সত্যিকাররূপে মেনে এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করে সমস্ত ধনসম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তারা নিজেদের কাছে না কোন আশরাফী রাখে, না টাকা-পয়সা। যাকাত ওয়াজেব হওয়ার কোন সুযোগই তারা রাখে না। জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দুশ' দেরহামে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজেব ? তিনি বলেন ঃ শরীয়তের আইনে সাধারণ মানুষের উপর পাঁচ দেরহাম ওয়াজেব, কিন্তু আমাদের উপর গোটা দুশ' দেরহামই দিয়ে দেয়া ওয়াজেব। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন দান খয়রাতের ফযীলত বর্ণনা করলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ এবং হযরত ওমর (রাঃ) অর্ধেক মাল দান করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তোমার

পরিবারের জন্যে কি রেখেছ ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে রেখেছি। হযরত ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি রেখেছ? তিনি বললেন ঃ পরিবারের জন্যে ততটুকু রেখে দিয়েছি, যতটুকু এখানে উপস্থিত করেছি। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের মধ্যে ততটুকু তফাৎ, যতটুকু তোমাদের কথার মধ্যে তফাৎ। দ্বিতীয় শ্রেণী তারা, যারা অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং অভাব-অনটনের সময় খয়রাতের মওসুমের অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের মর্তবা প্রথম শ্রেণীর তুলনায় কম। সঞ্চয় করার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য থাকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করা, বিলাসব্যসনে উড়িয়ে না দেয়া এবং প্রয়োজন মেটানোর পর কিছু বেঁচে গেলে সময় সুযোগ বুঝে তা সৎপথে ব্যয় করা। তারা কেবল যাকাতের অর্থ প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকে না; বরং অন্য দান-খয়রাত করে। নখয়ী, শা'বী, আতা ও মুজাহিদ প্রমুখ আলেমের অভিমত, অর্থ সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরও হক আছে। শা'বীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ হাঁ, আরও হক আছে। তুমি আল্লাহ তাআলার এই এরশাদ শ্রবণ করনি, وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى এবং মালের মহব্বত সত্ত্বেও তা আত্মীয় ও অনাথদেরকে দান করে। এই আলেম وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (আমি তাদেরকে যা দেই, তা থেকে তারা ব্যয় করে।) এবং وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ (তোমরা আমার দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় কর।) আয়াত দুটিকেও তাদের দাবীর সপক্ষে পেশ করে বলেন ঃ এসব আয়াত যাকাতের আয়াত দ্বারা রহিত হয়নি; বরং মুসলমানদের পারস্পরিক হক এসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । অর্থ এই, ধনী ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তকে পেলে যাকাত ছাড়া অন্য মাল দ্বারা তার অভাব দূর করবে। এ সম্পর্কে ফেকাহ্ শাস্ত্রের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, অভাবের কারণে কেউ মরণাপন্ন হয়ে গেলে তার অভাব দূর করা অন্যদের উপর ফরযে কেফায়া। কিন্তু এতে বলা যায়, ধনী ব্যক্তির উপর কেবল এতটুকু ওয়াজেব, যে পরিমাণ অর্থ দ্বারা তার অভাব দূর হয়ে যায়, সেই পরিমাণ অর্থ তাকে কর্জ দেবে । যাকাত দিয়ে থাকলে দান করে দেয়া তার উপর ওয়াজেব নয়। কেউ কেউ বলেন ঃ দান করাই ওয়াজেব- কর্জ দেয়া দুরস্ত নয়। মোট কথা, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে কর্জ দেয়া হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যাওয়া, যা সর্বসাধারণের স্তর।

তৃতীয় শ্রেণী তারা, যারা কেবল ওয়াজেব যাকাত আদায় করেই ক্ষান্ত থাকে - বেশীও দেয় না এবং কমও দেয় না। এটা সর্বনিম্ন মর্তবা । সাধারণ মানুষ তাই করে। কারণ তারা ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট ও কৃপণ হয়ে থাকে এবং পরকালের আসক্তি তাদের মধ্যে কম। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنْ يَّسْاَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا ـ

অর্থাৎ, যদি তিনি তোমাদের কাছে অর্থ সম্পদ চান এবং পীড়াপীড়ি করেন, তবে তোমরা কৃপণতা করবে।

যাকাত ওয়াজেব হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষকে কৃপণতা দোষ থেকে মুক্ত করা। কেননা, এটা হচ্ছে অন্যতম বিনাশকরী দোষ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى يتبع وعجائب المرء بنفسه ـ

তিনটি বিষয় বিনাশকারী- লোভ, খেয়ালখুশী এবং আত্মপ্রীতি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

যাদেরকে লোভ-লালসা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তারাই সফলকাম। বলাবাহুল্য, অর্থ সম্পদ দান করার অভ্যাস গড়ে তোলাই কৃপণতা দোষ দূর করার উপায় । এ কারণের দিক দিয়ে যাকাত পবিত্রকারী ; অর্থাৎ যাকাত যাকাতদাতাকে কৃপণতার মারাত্মক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে দেয়। এ পবিত্রকরণ ততটুকু হবে, যতটুকু মানুষ দান করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে আনন্দ ও খুশী অনুভব করবে। যাকাত ওয়াজেব হওয়াব তৃতীয় কারণ, নেয়ামতের শোকর আদায় করা। কেননা, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত যেমন বান্দার শরীরে নিহিত নেয়ামতের শোকর, তেমনি আর্থিক এবাদত অর্থসম্পদে নিহিত নেয়ামতেরও শোকর। সুতরাং যেব্যক্তি গরীবকে অভাবী হয়ে তার কাছে হাত পাততে দেখেও আল্লাহ তাআলার শোকর করে না যে, আল্লাহ তাকে ধনী করেছেন এবং অপরকে তার প্রতি মুখাপেক্ষী করেছেন, সে অত্যন্ত নীচ।

দ্বিতীয় আদব, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ যাকাত ওয়াজেব হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করে দেয়া, যাতে তাদের খোদায়ী আদেশ পালনে আগ্রহ বুঝা যায়, গরীবরা মানসিক শান্তি লাভ করে এবং সময়ের বাধাবিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকা যায়। বিলম্বে যাকাত আদায় করার মধ্যে অনেক বিপদাপদের আশংকা থাকে। প্রথমতঃ এতে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। সুতরাং অন্তরে পুণ্যের প্রেরণা প্রকাশ পেলে তাকে সুবর্ণ সুযোগ জ্ঞান করবে। এরূপ প্রেরণা ফেরেশতা কর্তৃক অবতীর্ণ হয়ে থাকে। মুমিনের অন্তর আল্লাহ তাআলার দু'অঙ্গুলির মধ্যস্থলে থাকে। তাতে পরিবর্তন আসতে দেরী লাগে না। এছাড়া শয়তান দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অপকর্মের আদেশ করে। তাই সৎকর্মের প্রেরণা অন্তরে উদয় হওয়া গনীমত মনে করবে। একত্রে যাকাত দিলে তা আদায় করার জন্যে কোন উত্তম মাস নির্দিষ্ট করে নেবে, যাতে মাসের গুণে নৈকট্য অধিক অর্জিত হয়। উদাহরণতঃ বছরের প্রথম ও সম্মানিত মাস মহররম মাসে অথবা পবিত্র রমযান মাসে যাকাত দেবে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ মাসে সর্বাধিক দান খয়রাত করতেন; এমনকি গৃহে কোন কিছু রাখতেন না। রমযানে শবে কদরেরও ফযীলত আছে, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলতেন ঃ রমযান বলো না। কেননা, এটা আল্লাহ তাআলার একটি নাম; বরং রমযান মাস বলো। যিলহজ্জ মাসও অন্যতম সম্মান ও ফযীলতের মাস। এতে হজ্জে আকবর হয়। কোরআনে উল্লিখিত আইয়্যামে মালূমাত এবং আইয়্যামে মাদুদাত এ মাসেই রয়েছে। রমযান মাসের শেষ দশ দিন এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অধিক ফযীলত রাখে।

তৃতীয় আদব হচ্ছে সুখ্যাতি ও রিয়া থেকে দূরে থাকার জন্যে গোপনে যাকাত আদায় করা। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

افضل الصدقة جهد المقل الى فقير فى سر -

সর্বোত্তম দান এই যে, দরিদ্র ও সম্বলহীন ব্যক্তি শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে তা গোপনে কোন ফকীরকে দিয়ে দেবে। জনৈক আলেম বলেন ঃ তিনটি বিষয় দান-খয়রাতে সওয়াব ভান্ডার। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে গোপনে দান করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা গোপনে কোন কাজ করলে আল্লাহ তাআলা তা গোপন খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর সে যদি তা প্রকাশ করে তবে আল্লাহ তাআলা তা গোপন খাতা থেকে প্রকাশ্য খাতায় স্থানান্তর করেন। এর পর যদি সে এ কর্মের কথা অন্য কাউকে বলে, তবে গোপন ও প্রকাশ্য উভয় খাতা থেকে তা দূর করে রিয়ার খাতায় লেখে দেয়া হয়। এক মশহুর হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেদিন ছায়াতলে রাখবেন যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি, যে কোন কিছু দান করলে তার বাম হাতও জানতে পারে না যে, ডান হাত কি দান করেছে। এক হাদীসে আছে- وصدقة السر تطفى غضب الرب। গোপন দান আল্লাহ তাআলার ক্রোধ নির্বাপিত করে। আল্লাহ বলেনঃ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ যদি দান খয়রাত গোপনে ফকীরদের হাতে পৌঁছাও, তবে এটা তোমাদের জন্যে উত্তম। গোপনে দান করার উপকারিতা হচ্ছে রিয়া ও খ্যাতির কুফর থেকে আত্মরক্ষা করা। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যারা খ্যাতির জন্যে দান করে, দানের কথা অন্যের কাছে বলে এবং দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করে, আল্লাহ তাআলা তাদের দান কবুল করেন না। যে দানের কথা অন্যের কাছে বলে বেড়ায় সে খ্যাতি অন্বেষণ করে। যে জনসমাবেশে দান করে, সে রিয়াকার। গোপনে দান করলে এ দুটি বিপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়। বুযুর্গগণ গোপনে খয়রাত করার ব্যাপারে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। গ্রহীতা যাতে দাতাকে চিনতে না পারে সে ব্যাপারে তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এজন্যে কেউ কেউ অন্ধের হাতে খয়রাত রেখে দিতেন। কেউ ফকীরের গমন পথে ও তার বসার জায়গায় খয়রাত ফেলে রাখতেন। কেউ ঘুমন্ত ফকীরের কাপড়ের কোণে খয়রাত বেঁধে দিতেন। কেউ অন্যের হাতে ফকীরের কাছে পৌঁছে দিতেন যাতে ফকীর দাতার অবস্থা না জানে। তারা আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করার উপায় সৃষ্টি করা এবং খ্যাতি ও রিয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশে এভাবে দান খয়রাত করতেন। যদি কোন এক ব্যক্তিকে অবহিত না করে খয়রাত করা অসম্ভব হয়, তবে মিসকীনকে সমর্পণ করার জন্যে একজন উকিলের হাতে খয়রাত সোপর্দ করা উত্তম। এতে মিসকীন জানতে পারবে না, দাতা কে ? কারণ মিসকীন জানলে রিয়া ও অনুগ্রহ উভয়টি হয়। আর উকিলের জানার মধ্যে কেবল রিয়াই হবে। সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশে দান করলে দানকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। কেননা, যাকাতের উদ্দেশ্য কৃপণতা দূর এবং

ধনসম্পদের মহব্বত হ্রাস করা। ধনসম্পদের মহব্বতের তুলনায় খ্যাতির মহব্বত মনকে অধিক আচ্ছন্ন করে। আখেরাতে উভয়টিই ক্ষতিকর। কিন্তু কৃপণতা কবরে দংশনকারী বিচ্ছুর এবং রিয়া বিষধর সর্পের আকৃতি লাভ করবে। মানুষকে উভয় শত্রু দুর্বল ও নির্ধন করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে এদের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় অথবা হ্রাস পায়।

চতুর্থ আদব, যেখানে জানা যায়, প্রকাশ্যে দান করলে অন্যরা উৎসাহিত হবে, সেখানে প্রকাশ্যে দান করবে। এক্ষেত্রে রিয়া থেকে আত্মরক্ষা করার উপায় আমরা রিয়া অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। প্রকাশ্যে দান করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ -

যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান খয়রাত কর, তবে তা খুবই ভাল। এটা এমন স্থলে, যেখানে অপরকে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য হয় অথবা সওয়ালকারী জনসমাবেশে সওয়াল করে। এক্ষেত্রে রিয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে দান বর্জন করা উচিত নয় ; বরং দান করা উচিত এবং মনকে যথাসম্ভব রিয়া থেকে মুক্ত রাখা দরকার। কারণ, প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে অনুগ্রহ প্রকাশ ছাড়া আর একটি অপকারিতা আছে। তা হচ্ছে, ফকীরের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া। কেননা, অধিকাংশ ফকীর তাদের স্বরূপ প্রকাশ পাওয়া অপছন্দ করে। সুতরাং প্রকাশ্যে প্রার্থনা করে সে যখন নিজের পর্দা নিজেই খুলে দেয়, তখন তার বেলায় এই অপকারিতা নিষিদ্ধ নয়। উদাহরণতঃ কেউ যদি গোপনে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপাচার করে, তবে প্রকাশ করা ও খোঁজাখুঁজি করা অন্যের জন্যে নিষিদ্ধ। কিন্তু যেব্যক্তি নিজে পাপাচার প্রকাশ করে, অন্যেরা তার পাপাচার প্রকাশ করলে তা তার জন্যে শাস্তির কারণ হবে। কিন্তু এ শাস্তির আসল কারণ সে নিজেই। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

من القى جلباب الحياء فلاغيبة له -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি লজ্জার মুখোশ দূরে নিক্ষেপ করে, তার গীবত গীবত নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً -

অর্থাৎ, আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় কর।

এ আয়াতে প্রকাশ্যে দান করারও আদেশ করা হয়েছে। কারণ, এতে অন্যদেরকে উৎসাহিত করার উপকারিতা আছে।

মোট কথা, প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে যেসব উপকারিতা ও অপকারিতা রয়েছে, সেগুলো সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত । ব্যক্তি বিশেষে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে । কতক পরিস্থিতিতে কতক ব্যক্তির জন্য প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম হয়। উপকারিতা ও অপকারিতা জানার পর কিভাবে দান করা উত্তম, তা আপনা আপনিই ফুটে উঠবে।

পঞ্চম আদব, দান-খয়রাতকে من ও اذى দ্বারা পণ্ড না করা । আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে من ও اذى দ্বারা বাতিল করো না। এ দুটি শব্দের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানীগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেন ঃ من শব্দের অর্থ দানের কথা আলোচনা করা এবং اذى শব্দের উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে দান করা। সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি من করে, তার দান নিষ্ফল হয়ে যায়। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ اذى কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ দানের কথা আলোচনা করা এবং মানুষের কাছে বলে বেড়ানো। কেউ বলেন ঃ من -এর উদ্দেশ্য হল দানের বিনিময়ে ফকীরের কাছ থেকে কাজ নেয়া আর اذى শব্দের অর্থ ফকীরকে লজ্জা দেয়া। কারও মতে, من হল দান করে ফকীরের কাছে অহংকার করা। আর সওয়াল করার কারণে ফকীরকে ধমকানো হলো اذى রসূলে আকরাম (সঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ প্রকাশকারীর দান কবুল করেন না। আমার মতে من -এর একটি শিকড় ও ভিত্তি আছে, যা অন্তরের অবস্থাসমূহের অন্যতম। এই অবস্থা মুখে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এর মূল হচ্ছে নিজেকে এরূপ মনে করা যে, সে ফকীরের প্রতি অনুগ্রহ করেছে। অথচ তার মনে করা উচিত ছিল, ফকীর তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। সে আল্লাহ তাআলার হক তার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। ফলে সে পবিত্র হবে ও দোযখ থেকে মুক্তি পাবে। যদি ফকীর দান কবুল না করত, তবে সে এই হকের মধ্যে আবদ্ধ থাকত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ দান-খয়রাত ফকীরের হাতে পৌঁছার পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার হাতে পড়ে। কাজেই বুঝা উচিত, দাতা আল্লাহ তাআলার হক

দেয় আর ফকীর তা গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তার রিযিক নেয়। দানের মাল প্রথমে আল্লাহ তাআলার হয়ে যায়, এর পর ফকীর পায়। মনে করুন, এই ধনী ব্যক্তির যিম্মায় যদি কারও কর্জ থাকত এবং সে বলে দিত, এই কর্জের টাকা আমার খাদেম অথবা গোলামকে দিয়ে দিয়ো, যার পানাহার ও ভরণ-পোষণ আমার যিম্মায়, তবে খাদেম অথবা গোলামকে কর্জের টাকা দিয়ে ধনী ব্যক্তি কি মনে করতে পারত, সে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে? এরূপ মনে করলে এটা তার নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা হবে। কেননা, পানাহার ও ভরণ পোষণ যার দায়িত্বে, সে-ই তার প্রতি অনুগ্রহ করে। ধনী ব্যক্তি তো কেবল তার কর্জের টাকা শোধ করে। সুতরাং কর্জ শোধ করা নিজেরই উপকার– অন্যের প্রতি অনুগ্রহ নয়। উপরে যাকাত ওয়াজেব হওয়ার যে তিনটি কারণ আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলো অথবা তার কোন একটি কারণ বুঝে নিলে কোন দাতা নিজেকে অন্যের প্রতি অনুগ্রহকারীরূপে চিন্তা করতে পারবে না। বরং এটাই বুঝবে যে, সে নিজের প্রতিই অনুগ্রহ করেছে; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রকাশ করার জন্যে অথবা নিজেকে কৃপণতার অনিষ্ট থেকে মুক্ত করার জন্যে অথবা ধনসম্পদের শোকর আদায় করার জন্যে দান করছে। এ তিন অবস্থায় তার মধ্যে ও ফকীরের মধ্যে অনুগ্রহের কোন ব্যাপার নেই। এ মূল কথা বিস্মৃত হলে এবং নিজেকে ফকীরের প্রতি অনুগ্রহকারী মনে করলে সে দানের কথা আলোচনা করে এবং ফকীরের কাছে প্রতিদান কামনা করে। اذى শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধমকানো, কটু কথা বলা ও কঠোর ব্যবহার করা, কিন্তু অন্তরে এর উৎপত্তির কারণ দু'টি– এক, ধনসম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া খারাপ মনে করা এবং দুই, এরূপ মনে করা, আমি ফকীর অপেক্ষা উত্তম। অভাবী হওয়ার কারণে ফকীর মর্তবায় আমার চেয়ে কম। এ দুটি বিষয়ই মূর্খতাপ্রসূত। উদাহরণতঃ অর্থকড়ি দেয়া খারাপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা। কারণ, কেউ যদি হাজার দেরহামের বিনিময়ে এক দেরহাম দেয়া খারাপ মনে করে, তবে তার চেয়ে নির্বোধ আর কে হবে? আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের জন্যে অর্থ দান করা হয়। এগুলো অর্থের তুলনায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। অথবা কৃপণতার অনিষ্ট দূর করার জন্যে অর্থ দান করা হয়। অথবা বেশী নেয়ামত পাওয়ার আশায় কিংবা শোকারগুজারীর জন্যে দান করা হয়। এসব কারণের মধ্যে কোনটিই খারাপ নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ নিজেকে ফকীর অপেক্ষা উত্তম মনে করা মূর্খতা। কেননা, মানুষ যদি ধনাঢ্যতার তুলনায় দারিদ্র্যের

ফযীলত জানতে পারে এবং ধনীদের বিপদাপদ অবগত হতে পারে, তবে সে কখনও ফকীরকে হেয় মনে করবে না। বরং তার মাধ্যমে বরকত হাসিল করবে এবং তার মর্তবা কামনা করবে। কারণ, ধনীদের মধ্যে যেব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হবে, সে ফকীরদের চেয়ে পাঁচ'শ বছর পরে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ هم الاخسرون ورب الكعبة কাবার প্রভুর কসম, তারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। হযরত আবু যর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা কারা? তিনি বললেন ঃ هم الاكثرون اموالا অর্থাৎ, যাদের কাছে প্রভূত ধনদৌলত রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা ফকীরের জন্যে ধনী ব্যক্তিকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। সে স্বীয় প্রচেষ্টায় অর্থ উপার্জন করে, পরিশ্রম করে তা বাড়ায় এবং হেফাযত করে। এর পর ফকীরকে প্রয়োজন অনুযায়ী দান করা তার জন্যে জরুরী করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে ফকীরের রুজির জন্যে সে কাজ কারবার করে, তাকে কিরূপে হেয় মনে করতে পারে? ফকীর ধনী ব্যক্তির চেয়ে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ধনী ব্যক্তি অপরের হক নিজের যিম্মায় গ্রহণ করে এবং অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসম্পদের হেফাযত করে। যখন সে মারা যায়, তখন অন্যে সেই ধনসম্পদ ভক্ষণ করে। এমতাবস্থায় ফকীরকে দেয়া কিরূপে খারাপ হতে পারে? এভাবে যখন দান করা খারাপ মনে করবে না; তখন ফকীরকে পেয়ে খুশী হবে, তার প্রশংসা করবে এবং তার অনুগ্রহ স্বীকার করবে। ফলে من ও اذى কিছুই থাকবে না। দান করার পর নিজেকে অনুগ্রহকারী মনে করার একটি বাহ্যিক প্রতিকার আছে। তা হচ্ছে, দাতা ফকীরের সামনে এমন কাজ করবে, যা কোন অনুগ্রহপ্রাপ্ত ঋণী ব্যক্তি করে। সেমতে কোন কোন বুযুর্গ ফকীরের সামনে দান রেখে নিজে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং দান কবুল করার জন্যে তাকে অনুরোধ করতেন। মনে হত যেন তিনিই সওয়ালকারী। বুযুর্গগণ তাঁদের কাছে ফকীরের আগমন ভাল মনে করতেন না; বরং তাঁরা স্বয়ং ফকীরের কাছে গিয়ে দান করা সমীচীন মনে করতেন। কতক বুযুর্গ হাতে দানের অর্থ রেখে ফকীরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন যাতে ফকীর তা তুলে নেয় এবং ফকীরের হাতই উপরে থাকে। হযরত আয়েশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) যখন কিছু খয়রাত কোন ফকীরের কাছে প্রেরণ করতেন, তখন দূতকে বলে দিতেন ঃ ফকীর

দোয়ার যেসব বাক্য বলবে, সেগুলো মুখস্থ করে আসবে। দূত ফিরে এসে দোয়ার বাক্য বর্ণনা করলে তাঁরাও সেসব দোয়ার বাক্য ফকীরের জন্যে উচ্চারণ করতেন এবং বলতেন, আমাদের খয়রাত বাঁচানোর জন্যে আমরা দোয়ার বদলে দোয়া করে দিলাম। মোট কথা, পূর্ববর্তীগণ দান করে ফকীরের কাছে দোয়া আশা করতেন না। কেননা, দোয়াও দানের একটি প্রতিদানের মত। কেউ তাদের জন্যে দোয়া করলে বিনিময়ে তার জন্যে তেমনি দোয়া তাঁরা করে দিতেন। হযরত ওমর ও তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) তাই করেছিলেন। যাকাতের মধ্যে من ও اذى না থাকার শর্ত নামাযের মধ্যে খুশু তথা বিনয়ের শর্তের স্থলবর্তী। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নামায সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ليس للمرء من صلوة الا ماعقل মানুষ নামাযের যতটুকু অংশ বুঝে, ততটুকুই পায়। যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ لايقبل الله صدقة منان আল্লাহ্ তাআলা কোন অনুগ্রহ প্রকাশকারীর খয়রাত কবুল করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও দানগ্রহীতার মনে কষ্ট দিয়ে তোমাদের খয়রাতসমূহ বরবাদ করো না। এ শর্তের অনুপস্থিতিতেও ফেকাহবিদরা ফতোয়া দেন, তার যাকাত আদায় হয়ে গেছে। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

ষষ্ঠ আদব, নিজের দানকে কম মনে করা। কারণ, অনেক মনে করলে আত্মপ্রীতিতেও লিপ্ত হবে, যা একটি মারাত্মক ব্যাধি। আত্মপ্রীতি আমলসমূহ বাতিল করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا -

হুনায়ন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত করে দিয়েছিল, অতঃপর তা তোমাদের কোন উপকার করেনি।

বলা হয়, এবাদতকে যতই ক্ষুদ্র জ্ঞান করা হবে, তা আল্লাহর কাছে ততই বড় হবে। পক্ষান্তরে গোনাহকে যতই বড় মনে করা হবে, তা আল্লাহর কাছে ততই ক্ষুদ্র হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ তিনটি বিষয়

ব্যতীত খয়রাত পূর্ণ হয় না– এক, খয়রাতকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করা, দুই খয়রাত আদায়ে বিলম্ব না করা এবং তিন, গোপনে খয়রাত করা। আত্মপ্রীতি ও বড় মনে করা সকল এবাদতেই রয়েছে। এর প্রতিকার হল এলেম ও আমল। এলেম একথা জানা যে, সমস্ত মালের মধ্যে দশ ভাগের একভাগ অথবা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ খুবই কম। এ পরিমাণ খয়রাত নেহায়েত নিম্নস্তরের খয়রাত। সুতরাং এই নিম্নস্তরের খয়রাতের জন্যে লজ্জা করা উচিত– একে বড় মনে করা উচিত নয়। আর যদি কেউ সমস্ত মাল অথবা অধিকাংশ মাল খয়রাত করে তবে তার চিন্তা করা উচিত যে, মাল তার কাছে কোত্থেকে এল এবং সে তা কোথায় ব্যয় করছে। মাল তো আসলে আল্লাহ তাআলার। তিনি অনুগ্রহপূর্বক বান্দাকে দান করেছেন এবং ব্যয় করার তওফীক দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর পথে অধিকাংশ দান করে তাকে বড় মনে করা উচিত নয়। যদি দোয়ার নিয়তে মাল দান করে, তবে যার বিনিময়ে দ্বিগুণ ত্রিগুণ সওয়াব পাবে, তাকে বড় মনে করবে কেন? আমল এই যে, লজ্জিত হয়ে দান করবে। কারণ, অবশিষ্ট মাল নিজের কাছে রেখে দেয়া হয়। এটা যেন এমন, যেমন কেউ কারও কাছে কিছু আমানত রাখে। এর পর ফেরত দেয়ার সময় কিছু অংশ ফেরত দেয় এবং কিছু অংশ রেখে দেয় । এটা লজ্জার বিষয় নয় কি? মাল সমস্তটাই আল্লাহর। তিনি সমস্তটা দান করার আদেশ দেননি । কারণ, কৃপণতার কারণে এ আদেশ পালন করা তোমাদের জন্যে কঠিন হত । সেমতে তিনি নিজেই বলেন ঃ فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا অর্থাৎ, যদি তিনি আতিশয্য সহকারে সমস্ত মাল দান করার আদেশ দেন, তবে তোমরা কৃপণতা করবে; সানন্দে ও সন্তুষ্ট চিত্তে দান করবে না।

সপ্তম আদব, নিজের মালের মধ্যে যা উৎকৃষ্ট; পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয় তাই খয়রাতের জন্যে বেছে নেয়া । কেননা, আল্লাহ তাআলা পবিত্র । তিনি পবিত্র মালই কবুল করেন। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্যে, যে গোনাহ ছাড়া হালাল উপায়ে অর্জিত মাল দান করে। নিকৃষ্ট মাল দান করার মানে হচ্ছে নিজের অথবা পরিবারের লোকদের জন্যে উৎকৃষ্ট মাল রাখা এবং আল্লাহ্ তাআলার উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া । এটা নিঃসন্দেহে বেআদবী । যদি কেউ মেহমানের সাথে এরূপ

ব্যবহার করে এবং ভাল খাদ্য নিজেরা খেয়ে মেহমানের সামনে খারাপ খাদ্য পেশ করে, তবে মেহমান নিঃসন্দেহে তার শত্রু হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ۔

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে এবং আমি মাটি থেকে যা উৎপন্ন করি, তা থেকে পবিত্র বস্তু ব্যয় কর। তোমরা ব্যয় করার জন্যে অপবিত্র বস্তুর নিয়ত করো না, যা তোমরা নিজেরা চক্ষু বন্ধ না করে গ্রহণ করতে পার না। অর্থাৎ এমন বস্তু দান করো না, যা তোমরা লজ্জা ও অপছন্দ ছাড়া গ্রহণ কর না।

মোট কথা, আপন পালনকর্তার জন্যে এমন বস্তু পছন্দ করো না। হাদীসে আছে, এক দেরহাম লক্ষ দেরহামকেও পেছনে ফেলে দেয়। কারণ, মানুষ এই একটি দেরহামকে তার উৎকৃষ্ট ও হালাল মাল থেকে সানন্দে দান করে। আর কখনও লক্ষ দেরহাম এমন মাল থেকে দান করা হয়, যাকে সে নিজেই খারাপ মনে করে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন, যারা আল্লাহর জন্যে এমন বস্তু সাব্যস্ত করে, যা তারা নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ۔

তারা তাদের অপছন্দনীয় বস্তু আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করে। তাদের মুখ মিথ্যা বর্ণনা করে, পুণ্য তাদের জন্যই। এটা স্বতঃসিদ্ধ, তাদের জন্যে রয়েছে অগ্নি।

অষ্টম আদব, দান খয়রাতের জন্যে এমন লোক তালাশ করা, যাদের দ্বারা দান-খয়রাত মর্যাদাশীল ও পবিত্র হয়। যেনতেন লোকের হাতে তা পৌঁছে দেয়া ঠিক নয়। ছয়টি গুণের মধ্যে থেকে দুটি গুণ যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাদেরকে খয়রাত দেবে।

প্রথম– এমন লোক তালাশ করবে, যে পরহেযগার, সংসারবিমুখ ও কেবল আখেরাতের ব্যবসায়ে লিপ্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لا تاكل الا طعام تقى ولا ياكل طعامك الا تقى۔

পরহেযগার ব্যক্তির খাদ্য ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার ছাড়া কেউ না খায়।

এর কারণ, পরহেযগার ব্যক্তি খেয়ে তার পরহেযগারীকে শক্তি যোগাবে। ফলে যে খাওয়াবে সে তার এবাদতে শরীক হয়ে যাবে। হাদীসে আরও আছে– তোমরা তোমাদের খাদ্য পরহেযগারদেরকে খাওয়াও আর অনুগ্রহ যা কর, ঈমানদারদের প্রতি কর। জনৈক আলেম তার দানের মাল সুফী ফকীরগণ ছাড়া অন্য কাউকে দিতেন না। তাকে কেউ বলল ঃ এ মাল বিশেষ এক সম্প্রদায়কে না দিয়ে সকল ফকীরকে দিলেই তো ভাল হত। তিনি বললেন ঃ না, এই বিশেষ সম্প্রদায়ের সাহসিকতা আল্লাহর জন্যে ব্যয়িত হয়ে যায়।। তারা উপবিষ্ট হলে তাদের সাহসিকতা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং এক ব্যক্তিকে দান করে যদি আমি তার সাহসিকতা আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করতে পারি, তবে এটা আমার মতে হাজার ব্যক্তিকে দান করা অপেক্ষা উত্তম, যাদের সাহসিকতা কেবল সংসারের দিকেই নিবিষ্ট। এ উক্তিটি হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ)-এর কাছে কেউ উত্থাপন করলে তিনি একে চমৎকার উক্তি বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন ঃ এ লোকটি একজন ওলী আল্লাহ। বহু দিন যাবত আমি এর চেয়ে উত্তম উক্তি শ্রবণ করিনি। কথিত আছে, এক সময় এই বুযুর্গ ব্যক্তি আর্থিক সংকটে পড়ে দোকান বন্ধ করে দিতে মনস্থ করেন। হযরত জুনায়দ তাঁর কাছে কিছু পুঁজি প্রেরণ করে বললেন ঃ এই অর্থ দ্বারা দোকানের মাল কিনে নাও, দোকান বন্ধ করো না। তোমার মত ব্যক্তির জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিকর নয়। লোকটি ছিলেন সবজি বিক্রেতা। কোন দরিদ্র লোক তাঁর কাছ থেকে সবজি ক্রয় করলে তিনি দাম নিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে এলেমধারী ব্যক্তিকে খয়রাত দেবে। তাকে দিলে তার এলেমকে সাহায্য যোগানো হবে। এলেম এবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যদি তাতে নিয়ত ঠিক তাঁকে। হযরত ইবনে মোবারক (রহঃ) দান-খয়রাত বিশেষভাবে এলেমধারীদেরকে দিতেন। কেউ তাঁকে বলল ঃ

আপনার খয়রাত ব্যাপকভাবে দিলেই তো ভাল হত। তিনি বললেন ঃ আমি নবুওয়তের মর্তবার পর আলেমদের মর্তবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন মর্তবা আছে বলে জানি না। আলেমের মন যদি অভাব অনটনে ব্যাপৃত থাকে, তবে সে এলেমের জন্যে সময় সুযোগ পাবে না। কাজেই তাঁকে দেয়ার অর্থ এলেমের জন্যে তাঁকে সুযোগ করে দেয়া।

তৃতীয়– তাকওয়ায় সাচ্চা ও তওহীদে পাকা ব্যক্তিকে খয়রাত দেবে। তওহীদে সাচ্চা হওয়ার অর্থ, যখন কারও কাছ থেকে খয়রাত গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ তাআলার হামদ ও শোকর করবে এবং মনে করবে, এ নেয়ামত তাঁরই পক্ষ থেকে। মধ্যবর্তী ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দরবারে বান্দার শোকর এটাই যে, সে সকল নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করবে। লোকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দেন, নিজের ও আল্লাহ তাআলার মাঝখানে অপরকে নেয়ামতদাতা সাব্যস্ত করবে না। যেব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপরের শোকর করে, সে যেন নেয়ামতদাতাকে চেনেই না এবং বিশ্বাস করে না যে, মধ্যবর্তী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। কেননা, আল্লাহ তাআলাই তাকে দানে বাধ্য করেছেন এবং দানের আসবাবপত্র সরবরাহ করেছেন। সে যদি দান না করতে চাইত, তবে তা পারত না। কেননা, পূর্বাহ্নে আল্লাহ মনে জাগরূক করেছেন যে, দান করার মধ্যেই তার ইহলৌকিক কল্যাণ নিহিত। যেব্যক্তি এটা বিশ্বাস করে, তার দৃষ্টি আল্লাহ ব্যতীত অপরের দিকে যাবে না। দাতার জন্য এরূপ ব্যক্তির বিশ্বাস প্রশংসা ও শোকরের চেয়ে বেশী উপকারী। যেব্যক্তি দান করার কারণে প্রশংসা ও দোয়া করে, সে দান না করার কারণে নিন্দা এবং বদ দোয়াও করতে পারবে। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক ফকীরের কাছে কিছু খয়রাত প্রেরণ করে দূতকে বলে দিলেন ঃ ফকীর যা বলে মনে রাখবে। ফকীর খয়রাত গ্রহণ করে বলল ঃ আল্লাহর শোকর, যিনি রিযিকদানকারীকে ভুলেন না এবং শোকরকারীকে বরবাদ করেন না। ইলাহী! আপনি আমাকে বিস্মৃত না হলে আপনার রসূল (সাঃ)-কে এমন করুন যে, তিনি আপনাকে না ভুলে যান। দূত এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জানালে তিনি ফকীরের উক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। দেখ, এই ফকীর তার দৃষ্টি কিভাবে আল্লাহ তাআলাতে নিবদ্ধ করেছে! রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে তওবা করতে বললে সে বলল ঃ আমি কেবল আল্লাহ

তাআলার দিকে তওবা করি– মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দিকে নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি হকদারের হক চিনতে পেরেছ। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদ মোচনের আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ আয়েশা! দাঁড়াও, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মস্তক চুম্বন কর। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি এরূপ করবো না। আমি আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে কৃতজ্ঞ নই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আবু বকর! তাকে ছাড়, কিছু বলো না। এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতা আবু বকরকে এই জওয়াব দেন–

الحمد لله لايحمدك ولايحمد صاحبك -

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার শোকর। এতে আপনার ও আপনার সঙ্গীর অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন অনুগ্রহ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অস্বীকৃতি জানাননি, অথচ অপবাদ মোচনের তাঁর মাধ্যমেই হযরত আয়েশার কাছে পৌঁছেছিল। নেয়ামত আল্লাহ তাআলা ছাড়া অপরের পক্ষ থেকে মনে করা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। সেমতে আল্লাহ বলেন–

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ -

যখন এককভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর স্তব্ধ হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য দেবদেবীদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যায়।

যেব্যক্তির অন্তর মাধ্যমের প্রতি তাকানো থেকে মুক্ত নয় এবং একে নিছক মাধ্যম মনে করে না, তার মন যেন শেরকে খফী তথা গোপন শেরক থেকে আলাদা হয়নি। তার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং স্বীয় তওহীদকে শেরকের ময়লা ও সন্দেহ থেকে পরিষ্কার করা।

চতুর্থ– যারা আপন অবস্থা গোপন রাখে, অভাব-অভিযোগ ও কষ্টের কথা খুব একটা বর্ণনা করে না, অথবা যেব্যক্তি পূর্বে ধনী ছিল, এখন সর্বস্বহারা, কিন্তু পূর্বের অভ্যাস পরিত্যাগ করে না এবং পুরোপুরি ভদ্রতা বজায় রেখে জীবন যাপন করে– এরূপ লোককে খয়রাত দেবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ـ

সওয়াল থেকে বেঁচে থাকার কারণে মূর্খরা তাদেরকে ধনী মনে করে। তুমি তাদেরকে চেহারা দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের গায়ে পড়ে সওয়াল করে না। অর্থাৎ, সওয়াল করার মধ্যে আতিশয্য করে না। কারণ, তারা আপন বিশ্বাসে ধনী এবং সবর দ্বারা সম্মানী। প্রত্যেক মহল্লায় ধার্মিক লোকদের মাধ্যমে এরূপ ব্যক্তিদের তালাশ করা উচিত। এরূপ সম্ভ্রমী লোকদের মনের অবস্থা খয়রাতকারীদের জানা উচিত। কেননা, তাদেরকে খয়রাত দেয়া প্রকাশ্য সওয়ালকারীদেরকে খয়রাত দেয়ার তুলনায় কয়েক গুণ বেশী সওয়াব রাখে।

পঞ্চম– যারা অধিক সন্তান-সন্ততিসম্পন্ন অথবা রোগাক্রান্ত অথবা কোন কারণে দুর্দশাগ্রস্ত, তাদেরকে খয়রাত দেবে। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ـ

সেসব ফকীরের জন্যে, যারা আল্লাহর পথে আটকা পড়েছে, তারা স্বদেশে চলাফেরা করতে পারে না। অর্থাৎ, যারা আখেরাতের পথে পরিবার-পরিজনের কারণে অথবা রুজি-রোজগারের স্বল্পতার কারণে অথাব আত্মসংশোধনের কারণে আটকা পড়েছে। ফলে দেশে সফর করার শক্তি রাখে না। কেননা, এসব কারণে তাদের হাতে পায়ে জিঞ্জির পড়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এক গৃহের লোকদেরকে এক পাল ছাগল অথবা দশটি ছাগল অথাবা আরও বেশী দান করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্তান-সন্ততির সংখ্যা অনুযায়ী দান করতেন। হযরত ওমর (রাঃ)-কে কেউ জাহ্দুল বালা'র উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ সন্তান সন্ততির আধিক্য এবং অর্থ সম্পদের স্বল্পতা।

ষষ্ঠ– যে ফকীর আত্মীয় এবং রক্তের সাথে সম্পর্কশীল, তাকে খয়রাত দেবে। এতে খয়রাতও হবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও বজায় থাকবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অনেক সওয়াব। হযরত

আলী (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি এক দেরহাম দিয়ে আমার কোন ভাইয়ের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি, তবে তা আমার মতে বিশ দেরহাম খয়রাত করা অপেক্ষা উত্তম। যদি বিশ দেরহাম দিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখি, তবে এটা একশ' দেরহাম খয়রাত করার চেয়ে ভাল। পরিচিতদের মধ্যে বন্ধুদেরকে আগে দান করা উচিত; যেমন অপরিচিতদের তুলনায় আত্মীয়কে আগে দেয়া উত্তম।

মোট কথা, এসব প্রার্থিত গুণের প্রতি লক্ষ্য রেখে খয়রাত দেয়া উচিত। এগুলোর প্রত্যেকটিতে অনেক স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর অন্বেষণ করা উচিত। কোন ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণের মধ্য থেকে কয়েকটি পাওয়া গেলে তাকে নেয়ামত মনে করতে হবে। যে উপযুক্ত লোক খোঁজাখুঁজি করবে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। ভুল হয়ে গেলেও এক সওয়াব নষ্ট হবে না।

যাকাতের হকদার হওয়ার কারণ

প্রকাশ থাকে যে, এমন ব্যক্তি যাকাতের হকদার, যে মুসলমান, স্বাধীন (হাশেমী ও মুত্তালেবী বংশীয় নয়) এবং যার মধ্যে কোরআন বর্ণিত আটটি গুণের মধ্য থেকে কোন একটি গুণ বিদ্যমান আছে। এই আটটি গুণ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কাফের, গোলাম ও হাশেমী বংশীয়কে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। নিম্নে আট প্রকার লোক আলাদা আলাদা বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম প্রকার– ফকীর। যার কাছে অর্থ-সম্পদ নেই এবং যে উপার্জনক্ষম নয়, তাকে ফকীর বলা হয়। যার কাছে একদিনের খাদ্য ও পোশাক আছে, সে ফকীর নয়; বরং মিসকীন। অর্ধেক দিনের খাদ্য থাকলে সে ফকীর। সওয়াল করা যেব্যক্তির অভ্যাস সে ফকীর দলের বাইরে নয়। কেননা, সওয়াল করা কোন উপার্জনের পেশা নয়। হাঁ, উপার্জন করতে সক্ষম হলে সে ফকীরদের দল থেকে খারিজ হয়ে যাবে। যন্ত্রপাতি দিয়ে উপার্জন করতে সক্ষম ব্যক্তিও ফকীর, তাকে যাকাতের টাকা দিয়ে যন্ত্রপাতি কিনে দেয়া জায়েয। যদি কেউ এমন পেশা অবলম্বনে করতে সক্ষম না হয়, যা তার ভদ্রতা ও মর্যাদার অনুপযোগী, তবে সে ফকীর বলেই গণ্য হবে। এমনিভাবে আলেম ব্যক্তির যদি কোন পেশা গ্রহণ এলেম চর্চায় বাধ্য সৃষ্টি করে, তবে সে-ও ফকীর। পেশা গ্রহণ করো

এবাদতে বাধা সৃষ্টি করলেও তা করা উচিত। কেননা, খয়রাতের তুলনায় কাজ করা উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন طلب الحلال فريضة بعد الفريضة হালাল জীবিকা অন্বেষণ ঈমানী ফরযের পরের ফরয। উদ্দেশ্য, উপার্জনের চেষ্টা করা দরকার। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ হালাল-হারামের সন্দিগ্ধ উপার্জন সওয়াল অপেক্ষা উত্তম।

দ্বিতীয় প্রকার– মিসকীন। যার আয় ব্যয়ের জন্যে যথেষ্ট নয়, তাকে মিসকীন বলা হয়। অতএব কেউ হাজার দেরহামের মালিক হয়েও মিসকীন হতে পারে। পক্ষান্তরে একটি কুড়াল ও রশির মালিক হয়েও মিসকীন না হতে পারে। মাথা গোঁজার মত গৃহ ও অবস্থানুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদ থাকলেই মানুষ মিসকীনদের দল থেকে খারিজ হয়ে যাবে না। এমনিভাবে ঘরকন্নার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও মানুষকে মিসকীনদের দল থেকে খারিজ করে দেয় না। ফেকাহ্ শাস্ত্রের কিতাবসমূহের মালিকানাও মিসকিনীর পরিপন্থী নয়। কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিছুর মালিক না হলে তার উপর সদকায়ে ফেতর ওয়াজেব নয়। কিতাবপত্র এবং পোশাক পরিচ্ছদও গৃহের জরুরী আসবাবপত্রের অনুরূপ। তবে কিতাবের প্রয়োজন বুঝার ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত। তিনটি উদ্দেশে কিতাবের প্রয়োজন হয়, পড়া, পড়ানো ও অধ্যয়ন করা। চিত্তবিনোদন কোন প্রয়োজন নয়। উদাহরণতঃ কবিতা, ইতিহাস, সংবাদপত্র এবং দুনিয়া ও আখেরাতে উপকারী নয় এমন কিতাব সংগ্রহ এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। এ ধরনের কিতাব মিসকিনীর পরিপন্থী। বেতনভুক্ত শিক্ষক যেসকল কিতাবের সাহায্যে পাঠদান করে, সেগুলো তার জন্যে দর্জি প্রমুখ পেশাদার ব্যক্তিদের যন্ত্রপাতির অনুরূপ। এগুলো থাকলেও কেউ মিসকীন হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার– আমেল (কর্মচারী)। বিচারক ও শাসনকর্তা ছাড়া যারা যাকাত আদায় করে, তারা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। দলপতি, হিসাব রক্ষক, ক্যাশিয়ার, নকল নবীশ প্রমুখ কর্মচারীও এর মধ্যে দাখিল। তাদের কাউকে এ কাজের সাধারণ মজুরির চেয়ে বেশী দেয়া যাবে না।

চতুর্থ প্রকার– তারা, যাদেরকে মন জয় করার উদ্দেশে যাকাতের অর্থ দেয়া হয়। তারা আপন আপন গোত্রের সর্দার হয়ে থাকে। তাদেরকে দেয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে ইসলামের উপর কায়েম রাখা এবং তাদের অধীনস্থদেরকে উৎসাহ প্রদান করা।

পঞ্চম প্রকার– মুকাতাব। যে গোলামকে তার প্রভু কিছু অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করতে বলে, তাকে মুকাতাব বলা হয়। মুকাতাবের অংশ তার প্রভুকে দেয়া উচিত। স্বয়ং মুকাতাবকে দেয়াও জায়েয। প্রভু তার মালের যাকাত মুকাতাবকে দেবে না। কেননা, সে এখনও তার গোলাম।

ষষ্ঠ প্রকার– ঋণী ব্যক্তি। যারা বৈধ কাজে ঋণ গ্রহণ করে, অতঃপর দারিদ্র্যের কারণে শোধ করতে পারে না; তারা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। গোনাহের কাজে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে যে পর্যন্ত তওবা না করে তাকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। ধনী ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ থাকলে যাকাতের অর্থ দ্বারা তা শোধ করা যাবে না। তবে সে কোন জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে তা শোধ করতে অসুবিধা নেই।

সপ্তম প্রকার– গাজী। সরকারী ভাতাভুকদের রেজিস্টারে যার কোন ভাতা নেই; তাকে যাকাতের একটি অংশ দেয়া উচিত– যদিও সে ধনী হয়। এতে জেহাদে সাহায্য করা হবে।

অষ্টম প্রকার– মুসাফির। যেব্যক্তি সফরের উদ্দেশে আপন শহর থেকে রওয়ানা হয়, সে মুসাফির। সফর গোনাহের উদ্দেশে না হলে এবং মুসাফির ব্যক্তি নিঃস্ব হলে তাকে যাকাত দিতে হবে। তার স্বগৃহে ধন সম্পদ থাকলে তাকে এতটুকু দিতে হবে, যদ্দ্বারা সে গৃহে পৌঁছতে পারে।

এখন প্রশ্ন, উপরোক্ত আট প্রকার হকদার ব্যক্তিকে কিরূপে চেনা যাবে? জওয়াব, ফকীর ও মিসকীনের বেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উক্তিই যথেষ্ট হবে। এ জন্যে সাক্ষ্য ও কসম নিতে হবে না। আমি ফকীর– কেউ একথা বললেই তাকে যাকাত দেয়া যাবে, যদি সে মিথ্যাবাদী বলে দৃঢ় বিশ্বাস না হয়। জেহাদ ও সফর ভবিষ্যতের ব্যাপার। যদি কেউ বলে, সে সফর অথবা জেহাদের ইচ্ছা রাখে, তবে তাকে দেয়া জায়েয। যদি কেউ পরবর্তীতে এই ইচ্ছা পূর্ণ না করে, তবে যা দেয়া হয়, তা ফেরত নিতে হবে। অবশিষ্ট চার প্রকার হকদারকে চেনার জন্যে সাক্ষী অত্যাবশ্যক। এ পর্যন্ত হকদার হওয়ার শর্ত ও কারণসমূহ বর্ণিত হল।